POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا
يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ
هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কিছুর ইবাদত করিতেছ যাহা না তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারে, না কোন উপকার, এবং আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(আল মায়েদা: ৭৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 18

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 1 May, 2025 2 জুল কাআদা-1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে আর কি-ই বা বলা যায়! খোদার কৃপা ও সমর্থন ছাড়া সে এক পা-ও চলতে পারে না। মানুষ যেহেতু এতসব রোগব্যধির লক্ষ্য এবং সমষ্টি, তাই শান্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র পথ হল খোদা তা'লার সঙ্গে নির্বিবাদ সম্পর্ক রাখা এবং তাঁর সত্যিকার এবং নিষ্ঠাবান বান্দা হওয়া।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

খোদাতে বিলীন ব্যক্তির মর্যাদা

খোদা তা'লার কৃপা ও সমর্থন ছাড়া মানুষ কিছুই করতে পারে না। মানুষ যখন আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং খোদাতে বিলীন হয়ে যায়, তখন তার দ্বারা সেই সব কাজ সম্পাদিত হয় যেগুলিকে ঐশী ক্রিয়াকলাপ বলা হয়। এমন ব্যক্তির উপর অতি উচ্চ মানের জ্যোতি প্রকাশিত হতে থাকে। মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে আর কি-ই বা বলা যায়, খোদার কৃপা ও সমর্থন ছাড়া সে এক পা-ও চলতে পারে না। বস্তুতপক্ষে, আমার বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি সাহায্য না পাওয়া যায়, তবে মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর মানুষ পরনের কাপড়টাও ঠিক করতে সক্ষম নয়। চিকিৎসগণ একটি ব্যধির কথা উল্লেখ করেছেন যাতে একটি হাঁচিই মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। নিশ্চিত জেনে রেখো! মানুষ সমুদয় দুর্বলতার সমষ্টি আর এই কারণেই খোদা তা'লা বলেছেন- خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا অর্থাৎ মানুষকে দুর্বল সৃষ্টি করা হয়েছে। (আননিসা: ২৯)। মানুষের নিজের বলতে কিছুই নেই। আপাদ মস্তক তার ততগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই, যতগুলি রোগব্যধি দ্বারা সে আক্রান্ত হয়। মানুষ যেহেতু এতসব রোগব্যধির লক্ষ্য এবং সমষ্টি, তাই শান্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র পথ হল খোদা তা'লার সঙ্গে নির্বিবাদ সম্পর্ক রাখা এবং তাঁর সত্যিকার এবং নিষ্ঠাবান বান্দা হওয়া। এবং এর জন্য সততা অবলম্বন করা আবশ্যক। ভৌতিক তন্ত্রও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা সততার পন্থা ত্যাগ করে অসাধুতার পথ বেছে নেয়, এবং মনে করে মিথ্যার আশ্রয় তাদেরকে পাপের পরিণতি থেকে রক্ষা করবে,তারা চরম ভ্রান্তিতে নিপতিত।

মিথ্যার আশ্রয় নিলে মানুষের হৃদয় অন্ধকারময় হয়ে ওঠে।

ক্ষণস্থায়ীভাবে মানুষ কিছুটা লাভ দেখতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ফলে মানুষের হৃদয় অন্ধকারময় হয়ে যায়, যদি সে মিথ্যার পথ বেছে নেয়, এবং ভিতর ভিতর তাতে ঘুণ খেয়ে নেয়। তখন একটি মিথ্যার কারণে তাকে বহু মিথ্যা উদ্ভাবন করতে হয়। কেননা সেই মিথ্যাটির উপর সত্যের প্রলেপ দিতে হয়। এভাবেই ভিতর ভিতর তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ ক্রমশ ক্ষীণ হতে শুরু করে। তখন সে এতটাই ধৃষ্ট ও উদ্ধত হয়ে ওঠে যে খোদা তা'লার নামেও মিথ্যা রচনা করতে শুরু করে এবং খোদার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদেরকেও প্রত্যাখ্যান করে। এইরূপে সে খোদার দৃষ্টিতে সব চায়তে বড় অত্যাচারী বিবেচিত হয়। যেমনটি আল্লাহ্‌ তা'লা বলেছেন-

مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ (আল আনআম, আয়াত: ২১) অর্থাৎ সেই ব্যক্তির থেকে বড় অত্যাচারী কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে কিম্বা তাঁর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে? নিশ্চয় জেনে রেখো! মিথ্যা ভয়ানক মন্দ বিষয়, যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। মিথ্যার কারণে মানুষ খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও তাঁর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়। মিথ্যার পরিণতি এর থেকে ভয়ানক আর কি হতে পারে? অতএব, সত্যের পথ অবলম্বন কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৩) : ১৮৪-১৮৬)

কবিদের উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে আনন্দ দেওয়া এবং মানুষের প্রশংসা কুড়োনো।

يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ○ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ
وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ○ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ

অনুবাদ: আর যে আছে কবিগণ- বিপথগামীগণই তাহাদের অনুসরণ করে। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, তাহারা উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় এবং তাহারা যাহা বলে তা পালন করে না?

সূরা শোয়রার ২২৫-২২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ তোমরা কি দেখনা যে, কবি বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য কখনও এদিক সেদিকের কথা বলে। তাদের সামনে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে না, বরং যা কিছু তাদের মাথায় আসে,তা নিয়ে কিছু না কিছু তারা বলতে শুরু করে দেয়। কবিদের কোনও কবিতার উদাহরণ নিলে فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ , এর দৃশ্য তাদের প্রতিটি কবিতায় তোমরা দেখতে পাবে। একটি কবিতায় লেখা থাকবে আমি মারা গেছি। আমার প্রেমাস্পদ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমি তার বিরহে, তার রুক্ষ আচরণে উন্মাদ হয়ে গেছি । কিন্তু পরের কবিতাতেই লিখছে, আমি আমার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হলাম, আমি প্রাণ ফিরে পেলাম, জীবিত হয়ে উঠলাম। সমগ্র কবিতার একটি পঙক্তিও অপরটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একটি পঙক্তিতে সে একথা বলে, অপরটিতে অন্য কিছু। একটি পঙক্তিতে লেখে, প্রেমাস্পদের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে, দ্বিতীয়টি লেখে, আমি মরে যাচ্ছি। মোটকথা, তাদের কবিতার প্রতিটি ছন্দে স্ববিরোধ পাওয়া যায়। কবিতার কোনও হাত-পা থাকে না। অসঙ্গত কথাবার্তা থাকে কেবল। কখনও বলে, প্রেমাস্পদের ভালবাসায় মারা গেছি, অথচ সে জীবিত দাঁড়িয়ে কবিতা শোনাচ্ছে। কখনও বলে, আমি আমার প্রেমাস্পদের প্রেমে বিভোর। অথচ সে সুন্দর দুনিয়ার কাজ করছে। কখনও বলে, প্রেমাস্পদ সর্বক্ষণ তার অন্তরে থাকে আর একথা একেবারে মিথ্যা। কখনও বলে, আমি প্রেমাস্পদের জন্য যারপরনায় মর্মযাতনায় কাতরাচ্ছি, অথচ সে নির্বিঘ্ন ও আনন্দময় জীবন অতিবাহিত করছে। সে মরেও না মর্মযাতনাও পোহায় না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য মানুষের ভাবাবেগকে উস্কে দেওয়া, সেটা ইতিবাচকভাবে হোক বা নেতিবাচকভাবে। কখনও সে আনন্দের কথা বলে, কখনও দুঃখের। আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ অর্থাৎ তারা জঙ্গল ও প্রতিটি উপাত্যকায় উন্মাদের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়। তারা কোথাও ভাবাবেগকে উত্তেজিত করার কোনও উপাদান পেলেই তা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা কখনও প্রেমিককে আনন্দ দেয়, কখনও প্রেমাস্পদকে। তারা ধনীদেরকে আনন্দিত করে আবার দরিদ্রদেরকেও। তারা অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়কেই খুশি করে। তারা বিজয়ী ও বিজীত উভয়কেই খুশি করে। সকলকে আনন্দ দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য, তাতে তাদের কবিতায় যত খুশি মিথ্যার বচন হোক। তাই তারা কখনও ধনীদের প্রশংসা করে, উদ্দেশ্য থাকে কিছু অর্থলাভ বা ভাতা নির্ধারণ করিয়ে নেওয়া, অন্যথায় তাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কোনও আগ্রহ থাকে না। একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি একবার একবার উত্তম পরিধানে পরিহিত কয়েকজন ব্যক্তিকে দেখে মনে করল, সম্ভবত এরা কোনও নেমন্তন্নে যাচ্ছে। আমিও তাদের সঙ্গে যাই। তারা যখন খাবার খেতে শুরু করবে, তখন আমিও সেখান থেকে খেয়ে নিব। তাই সে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। যেতে যেতে সে বাদশাহর দরবারে পৌঁছে গেল। তারা বাদশাহর প্রশংসায় কাসিদা পড়তে শুরু করল। তখন সে জানতে

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টান্ত একটি বাগানের মতো। এক জায়গায় মানুষ কোন ধরণের ফল চায় আর একটু সামনে এগিয়ে অন্য আরেক ধরনের ফল চায়। [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব এবং রমযানের সাথে এর যে সম্পর্ক রয়েছে তা অনেক বেশি। অতএব, এ বিষয়টি সর্বদা মনে উচিত এবং পবিত্র কুরআন পাঠ করা, শ্রবণ করা এবং দরস ইত্যাদিতে যোগদানের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

অনুবাদ এবং দরস শুনে তা আমাদের মেনে চলতে হবে। পবিত্র কুরআন যেসব আদেশ দিয়েছে, যে শিক্ষা দিয়েছে, তা আমাদের মেনে চলতে হবে। যদি শুধুমাত্র শুনি এবং ভুলে যাই এবং পড়ি কিন্তু মনোযোগ না দেই তাহলে সেই কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়, যা পবিত্র কুরআন থেকে আমরা লাভ করতে পারি।

এটা আমাদের দুর্ভাগ্য হবে যদি আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যাখ্যা, অর্থ ও কুরআন শরীফের তাফসীর বুঝে তার ওপর আমল না করি।

আল্লাহ্ তা'লা তো এই যুগে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। অতএব, তাঁকে মানা, তাঁর কথা শোনা এবং তাঁর কুরআন মজীদের তফসীরগুলি নিয়ে চিন্তা করা ও সেগুলোর ওপর আমল করা এখন আমাদের কাজ। যদি আমরা তা করি তাহলে আমাদের জীবন সফল হবে।

শিশুদের আমীন অনুষ্ঠানের জন্য লোকেরা আমার কাছে আসে, তাদের মনে রাখা উচিত যে, তারা একটি কর্তব্য পালন করেছে যে, তারা শিশুদের কুরআন মজীদ পড়িয়েছে। এখন এই কুরআন মজীদ পড়ার স্থায়ী আগ্রহ তৈরি করাও তাদের কাজ, এবং এটি তখনই সম্ভব যখন পিতামাতা নিজেরাও এদিকে মনোযোগ দেবেন। যখন তারা নিজেরাও নিয়মিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করবেন যাতে শিশুরা দেখে যে, আমাদের পিতামাতা তিলাওয়াত করছেন।

প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা যা কিছু পাব, তা কুরআন শরীফের কল্যাণেই পাব এবং আমাদের এদিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

এ বিষয়টি আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার যে, পবিত্র কুরআনই সেই শিক্ষা যা আমাদেরকে সফলতার শিখরে পৌঁছে দিবে আর এর দ্বারাই আমরা সফলতা লাভ করব, যদি আমরা এর শিক্ষা অনুযায়ী আমল করি এবং পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করি।

যে ব্যক্তি না কুরআন পড়ে, না এর উপর আমল করে, তার জীবন তো চরম কপটতাময় জীবন। তার মুসলমান হবার কেবল মৌখিক দাবি রয়েছে কিন্তু সে মোটেও ইসলামের শিক্ষা পালন করছে না। কেননা ইসলামের শিক্ষা পালন কুরআনের শিক্ষা অর্জন ব্যতী ত অসম্ভব। কুরআন করীমের আদেশাবলির প্রতি গভীর অভিনিবেশ ব্যতীত অসম্ভব।

মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে যেসব ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে, তারা পরস্পর একে অন্যকে হত্যা করছে, অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে, সরকার জনগনের সাথে লড়াই করছে, জনগন সরকারের সাথে লড়ছে, পরস্পর একে অন্যকে হত্যা, লুণ্ঠন হচ্ছে, সীমালঙ্ঘন হচ্ছে, এগুলো এজন্য হচ্ছে যে কুরআন করীমের উপর আমল নেই।

হযরত সোহায়েব (রা.) বর্ণিত একটি রেওয়ায়ে উল্লেখ রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে-ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে কার্যত বৈধ মনে করে তার কুরআনের প্রতি কোন ঈমান নেই।

মহানবী (সা.) একবার বলেন- প্রকাশ্যে কুরআন করীম পাঠকারী, প্রকাশ্যে সদকা প্রদানকারীর মত আর গোপনে কুরআন করীম পাঠকারী, গোপনে সদকা প্রদানকারীর অনুরূপ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, মানুষের উচিত যেন পবিত্র কুরআন অধিক হারে পাঠ করে। এতে দোয়ার স্থান আসলে দোয়া করে। এবং যেসব স্থানে আযাবের কথা রয়েছে সেখানে এটা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং সেসব অপকর্ম থেকে বিরত হয় যার কারণে সেই জাতি ধ্বংস হয়েছিলো।"

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৪ই মার্চ, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (১৪ই আমান, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় আমরা রমযানের দ্বিতীয় দশক অতিবাহিত করছি। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সাথে রমযানের এক বিশেষ সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। একটি বিশেষ সম্বন্ধ বর্ণনা করে বলেছেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ۔

অর্থাৎ, এই রমযান মাস, যাতে মানুষের জন্য এক মহান হিদায়াতরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে; এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি সহ যাতে হিদায়াতের বিশদ বিবরণ আর সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যসূচক বিষয়াদি রয়েছে ।

(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৬)

তাই এজন্য এমাসে এটি (পবিত্র কুরআন) পাঠের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এযুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও (কুরআন পাঠের প্রতি) মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, যাকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে ইমাম নিযুক্ত করেছেন। মহানবী (সা.) বিশেষভাবে এর প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন যে, পবিত্র কুরআন অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পাঠ করো। বছর জুড়ে পবিত্র কুরআনের যতটুকু অংশ অবতীর্ণ হতো তা হযরত জিব্রাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-কে দিয়ে একবার পুনরাবৃত্তি করাতেন আর তাঁর (সা.) জীবনের শেষ বছরে এটি দু'বার সম্পন্ন হয়েছিল।

(সহীহ বুখারী, কিতাব ফাযাইলিল কুরআন, হাদীস-৪৯৯৭)

কাজেই, পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব এবং রমযানের সাথে এর যে সম্পর্ক রয়েছে তা অনেক বেশি। অতএব, এ বিষয়টি সর্বদা মনে উচিত এবং পবিত্র কুরআন পাঠ করা, শ্রবণ করা এবং দরস ইত্যাদিতে যোগদানের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমাদের এখানে বিভিন্ন মসজিদে পবিত্র কুরআনের দরস ও তারাবির আয়োজন করা হয়। পবিত্র কুরআন পাঠের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এমটিএ'তেও প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত সম্প্রচার করা হয়, তাও শোনা উচিত। তবে, এথেকে তখনই কল্যাণ লাভ করা সম্ভব এবং তখনই এথেকে উপকৃত হওয়া যাবে যখন তা শোনার পর আমরা এর ওপর আমল করার চেষ্টা করবো।

অনেক মানুষ আছেন, যারা আরবী ভাষা জানেন না, পবিত্র কুরআন যথাযথভাবে বুঝতে পারেন না, সেক্ষেত্রে এর বিভিন্ন (ভাষায়) অনুবাদ রয়েছে। (কুরআন) তিলাওয়াতের সাথে সাথে এর অনুবাদও পাঠ করা উচিত। দরসের সময় আমাদের অভিনিবেশ করা উচিত। খলীফাগণ (বিভিন্ন সময়) যা বর্ণনা করছেন, তাঁদের বিভিন্ন খুতবা রয়েছে; এছাড়া দরসেও যা বর্ণনা করা হয়েছে তা দ্বারা আমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে।

কাজেই, লাভবান হতে চাইলে- তখনই লাভবান হওয়া সম্ভব যখন আমরা পবিত্র কুরআন পাঠ করে এর ওপর আমল করার চেষ্টা করবো। আর রমযানের দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, পবিত্র কুরআন যা আমি রমযানে অবতীর্ণ করেছি এটি বিশেষভাবে পাঠ করো এবং এর ওপর আমল করার চেষ্টা করো আর তোমরা এমনটি করলে, এটি তোমাদের জীবনের অংশে পরিণত হবে। অতএব, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, এতে হিদায়াত রয়েছে; আর এই হিদায়াতের ওপর মানুষ তখনই পরিচালিত হতে পারে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের জ্ঞান তখনই উপকারে আসতে পারে যখন আমরা এটি মেনে চলবো।

অতএব, যেমনটি আমি বলেছি, (কুরআনের) অনুবাদ এবং দরস শুনে তা আমাদের মেনে চলতে হবে। পবিত্র কুরআন যেসব আদেশ দিয়েছে, যে শিক্ষা দিয়েছে, তা আমাদের মেনে চলতে হবে। যদি শুধুমাত্র শুনি এবং ভুলে যাই এবং পড়ি কিন্তু মনোযোগ না দেই তাহলে সেই কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়, যা পবিত্র কুরআন থেকে আমরা লাভ করতে পারি।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের শুরুতেই সূরা আল্ বাকারার তৃতীয় আয়াতে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন যে, ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ, এটি সেই গ্রন্থ যাতে কোনো সন্দেহ নাই আর মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শকস্বরূপ। কাজেই, তাকওয়ার পথে পরিচালিত হতে, একজন প্রকৃত মু'মিন হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এই গ্রন্থের শিক্ষা মেনে চলাকে আবশ্যক আখ্যা দিয়েছেন। আর রমযানে আমরা এ বিষয়ের সন্ধানেই থাকি যে, কীভাবে আমরা তাকওয়ার পথে পরিচালিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করব। একজন সত্যিকার মু'মিন হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব, হিদায়াত লাভ করব এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হবো। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন, যদি এমনটি উদ্দেশ্য হয় তাহলে এই গ্রন্থ তোমাদেরকে প্রদান করেছি, এটি মেনে চলো আর যখন তোমরা এটি মেনে চলবে তখন তোমরা অগণিত কল্যাণ লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, এটি এমন এক ঝর্না, কোনো ব্যক্তি যদি পবিত্র অন্তঃকরণে এথেকে কল্যাণ লাভ করতে চায় তাহলে সে লাভবান হবে। সে তাকওয়ার ক্ষেত্রেও অগ্রসর হতে থাকবে এবং সে হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যেও গণ্য হবে। কেননা, এটি সেই গ্রন্থ যাতে কোনো সন্দেহ নাই যে, এটি মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াতস্বরূপ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'এর আশিস ও কল্যাণরাজির দ্বার সদা প্রবাহমান আর এটি সকল যুগে ঠিক সেভাবেই উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান যেমনটি মহানবী (সা.) -এর যুগে ছিল।'

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৭)

কাজেই, এই গ্রন্থের দাবি হলো, তোমরা যদি পবিত্র অন্তঃকরণে এর দিকে অগ্রসর হও তাহলে সকল প্রকার মন্দ থেকে রক্ষা পাবে, হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকওয়ার পথে বিচরণকারী হবে। আর যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এর কল্যাণরাজি সর্বদা প্রবাহমান। এর মান্যকারীরা সব ধরনের মন্দকর্ম থেকে সদা সুরক্ষিত থাকবে। পথিমধ্যে কাঁটাযুক্ত যে ঝোপঝাড় রয়েছে অর্থাৎ, যেসব নোংরা বিষয়াদি মানুষের মনোযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর তাকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং যা মন্দের দিকে ধাবিত করে, যদি পবিত্র কুরআন অনুসরণের মাধ্যমে এর ওপর আমল করতে থাকি তাহলে আমরা এগুলো থেকে নিরাপদে থাকব। অতএব, আমাদেরকে এ বিষয়টি সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, রমযানে যখন আমরা এদিকে, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন পাঠ এবং শ্রবণ করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করি, তারাবীতে যাই, দরস শুনতে যাই, বাড়িতেও আগের চেয়ে বেশি পবিত্র কুরআন পাঠ করা হয়; যদি কেউ সম্পূর্ণ কুরআন একবার খতম করতে নাও পারে- এ দিনগুলোতে কমপক্ষে কিছু না কিছু সময় অবশ্যই তিলাওয়াত করে থাকে। প্রথমত, রমযানে একবার কুরআন খতম করার চেষ্টা করা উচিত। যেমনটি আমি বলেছি, মহানবী (সা.)-এর সুন্নত এটিই ছিল, তিনি রমযানে বিশেষভাবে একবার কুরআন খতম করতেন আর হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাঁকে দিয়ে পুনরাবৃত্তি করাতেন। তাই লাভবান হওয়ার জন্য, এই সুন্নত অনুসরণের জন্য, এথেকে কল্যাণ লাভ করতে আমাদেরকে একবার হলেও কুরআন খতম দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, যেমনটি আমি বলেছি, যে তফসীর ও অনুবাদ রয়েছে (যারা আরবী জানেন না, আরব দেশগুলো ছাড়া পৃথিবীতে এমন অনেক (মানুষ) আছে, যারা আরবী জানে না) তাদের (কুরআন পড়ার) পাশাপাশি এর অনুবাদ পড়ে দেখা উচিত। যেমনটি গত খুতবায়ও আমি বলেছিলাম, এর ওপর আমল করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পয়েন্ট বের করা উচিত যেন আমরা এগুলো মেনে চলতে পারি এবং হিদায়াত লাভ করতে পারি। এরপর আমরা ভালো -মন্দের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারবো, প্রকৃত সুপথের জ্ঞান আমরা লাভ করবো। তাকওয়ার সঠিক পথের জ্ঞান আমরা লাভ করবো আর এভাবে আমরা অনুশীলন করে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি হতে কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবো ।

অনেকে এটি মনে করে বা ধারণা করে যে, পবিত্র কুরআন একটি কঠিন গ্রন্থ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (সূরা আল্ ক্বমর: ১৮) অর্থাৎ, আর নিশ্চয় আমরা কুরআনকে নসীহতের জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব নসীহত গ্রহণ করার মতোকেউ আছে কি?

অতএব এটি হলো আল্লাহ তা'লার দাবি। এটি তাঁর দাবি যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানেন। তার অবস্থা সম্পর্কে জানেন। তার সামর্থ্য বা যোগ্যতা সম্পর্কে জানেন। তিনি বলেন যে, আমি তোকুরআন মাজীদে সহজ শিক্ষা দিয়েছি। এর উপর আমল করার জন্য তোমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে এবং যদি তোমরা চেষ্টা করো তবে তোমরা সফলও হবে এবং এর উপর আমলকারীও হতে পারবে। অতএব তোমাদের জন্য উপদেশ এটিই যে, এর উপর আমল করার জন্য নিজের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করো। শুধু নামের মুসলমান হয়ো না।

আমাদের, বিশেষ করে আমরা আহমদীদের, শুধু এই দাবি করা উচিত নয় যে, যেহেতু আমরা নিশ্চিতভাবে কেবল নামসর্বস্ব মুসলমান নই, বরং আমরা এই যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীকে মেনেছি আর এজন্য মেনেছি যাতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারীকে মেনেছি যাতে আমরা আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করে সেটিকে পূর্ণ করতে পারি, অতএব যখন আমরা তাঁকে মেনেছি তখন আমাদের অবশ্যই কুরআন মাজীদের আদেশ পালনকারীও হতে হবে। যদি আমাদের মধ্যে এই গুণ না থাকে তাহলে আমাদের বয়আতের দাবিও নিষ্ফল হবে।

আল্লাহ্ তা'লা তো বলে দিয়েছেন যে, আমি এই কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি এবং মানবীয় প্রকৃতিকে সামনে রেখে খুবই সহজ উপায়ে উপদেশ দিয়েছি যার উপর প্রত্যেক মানুষ খুব সহজেই আমল করতে পারে।

যুগ ইমামের বাণী

শাহাদতের প্রাথমিক ধাপ হল খোদার পথে অবিচল ও অটল থাকা। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

দোয়াপ্রার্থী: Late Younus Gazi From-Raju Gazi
Sb. Ghutiari Shareef, 24 PGS (s)

আল্লাহ্ তা'লা নিয়ম-কানুন বর্ণনা করে দিয়েছেন, আদেশাবলি বর্ণনা করেছেন, ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। অর্থনীতি ও সামাজিক আদেশ ও পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তা বর্ণনা করেছেন, এজন্য যাতে তোমরা যদি এগুলির উপর আমল করো তাহলে তোমাদের জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হবে, তোমাদের পরিবেশও শান্তিপূর্ণ থাকবে এবং তোমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারীও হতে থাকবে। অতএব এই কথাটি আমাদের প্রত্যেকের বোঝা উচিত। আর যদি আমরা এটি বুঝতে পারি তাহলে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে থাকব। আমাদের পারিবারিক সম্পর্কও ভালো থাকবে, আমাদের সামাজিক সম্পর্কও ভালো থাকবে। এছাড়া আমাদের অন্যান্য যেসব মানসিক সামর্থ্য রয়েছে তাতেও অনেক উন্নতি আসবে, সেগুলোও বিকশিত হবে। আল্লাহ্ তা'লার ইরফান বা পরিচয় লাভের প্রতি আমাদের মনোযোগ বাড়বে।

আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান যে, এই যুগে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক পেয়েছি। যাকে আল্লাহ্ তা'লা বিচারক ও ন্যায়পরায়ণ হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং তিনি কুরআন মজীদের গুপ্ত ভাণ্ডার আমাদেরকে দান করেছেন এবং কুরআনের অসংখ্য তত্ত্ব জ্ঞান আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন। আমাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য আমাদেরকে স্পষ্টভাবে সেসব নির্দেশাবলি, যেগুলো কখনো কখনো আমরা বুঝতে পারি না, সেগুলিও তিনি ব্যাখ্যা করে আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যখন এটি বলেছেন যে, আমি কুরআনকে সহজ করেছি, তখন সহজ করার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকও প্রেরণ করেছেন। আর বর্তমান যুগে জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের দরজা খোলার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন, যিনি আমাদের সবকিছু জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য হবে যদি আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যাখ্যা, অর্থ ও কুরআন শরীফের তাফসীর বুঝে তার ওপর আমল না করি। আল্লাহ্ তা'লা তো এই যুগে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। অতএব, তাঁকে মানা, তাঁর কথা শোনা এবং তাঁর কুরআন মজীদের তফসীরগুলি নিয়ে চিন্তা করা ও সেগুলোর ওপর আমল করা এখন আমাদের কাজ। যদি আমরা তা করি তাহলে আমাদের জীবন সফল হবে। এছাড়া খলীফারাও তফসীর লিখেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তফসীরে কবীর লিখেছেন,যা প্রায় অর্ধেক কুরআন কভার করে। এছাড়াও অন্যান্য অনুবাদ ও তফসীর রয়েছে, তফসীরে সগীর রয়েছে, যা যথেষ্ট ব্যাখ্যাসহ লেখা হয়েছে। আর এগুলো এমন সব গ্রন্থ যেখানে আদেশাবলি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইংরেজিতেও এগুলোর অনুবাদ হচ্ছে, আরবীতেও অনুবাদ হচ্ছে আর জার্মানসহ আরও বিভিন্ন ভাষাতেও অনুবাদ হচ্ছে। তাই এদিকে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত যে, আমরা যেখানে রমজান মাসে কুরআন পাঠের দিকে মনোযোগ দিই এবং এটি একবার সম্পূর্ণ পাঠ করার চেষ্টা করি, সেখানে এর অর্থের দিকেও যেন মনোযোগ দিই, এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করি এবং আদেশাবলি অনুসন্ধান করি, সেগুলো খুঁজে আমাদের জীবনের অংশ বানানোর চেষ্টা করি। শুধু কুরআন মজীদকে ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়, শুধু সুন্দরভাবে রাখাই যথেষ্ট নয়, এটিকে শুধু কপালে স্পর্শ করা যথেষ্ট নয়।

শিশুদের আমীন অনুষ্ঠানের জন্য লোকেরা আমার কাছে আসে, তাদের মনে রাখা উচিত যে, তারা একটি কর্তব্য পালন করেছে যে, তারা শিশুদের কুরআন মজীদ পড়িয়েছে। এখন এই কুরআন মজীদ পড়ার স্থায়ী আগ্রহ তৈরি করাও তাদের কাজ, এবং এটি তখনই সম্ভব যখন পিতামাতা নিজেরাও এদিকে মনোযোগ দেবেন। যখন তারা নিজেরাও নিয়মিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করবেন যাতে শিশুরা দেখে যে, আমাদের পিতামাতা তিলাওয়াত করছেন।

যখন তারা নিজেরাও এর অনুবাদ ও তফসীর পড়বেন যাতে তারা নিজেরা বুঝতে পারেন যে, কী আদেশ রয়েছে আর যখন শিশুরা প্রশ্ন করে তখন তারা তাদের উত্তরও দিতে পারেন। কতক শিশু ছোট ছোট প্রশ্ন করে এবং পিতামাতা লিখে পাঠিয়ে দেন যে, এর উত্তর কী? অথচ যদি তারা অনুবাদ ও তফসীর সামান্যও পড়ে থাকেন তাহলে পিতামাতারা নিজেরাই উত্তর দিতে পারেন এবং তাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।

অতএব, এটি এখন পিতামাতারও দায়িত্ব যে, আমীন অনুষ্ঠানের পর তাদের দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে যে, যে আল্লাহ্ তা'লার কিতাব, যে হেদায়েতের কিতাব, যে জ্ঞানের কিতাব আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দান করে ছেন, সেটি আমরা আমাদের শিশুদের পড়িয়েছি, এখন এর ভালোবাসাও তাদের অন্তরে সৃষ্টি করতে হবে। আর সেই ভালোবাসা তখনই সৃষ্টি হবে যখন আমরা নিজেরাও এই কিতাবের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করব। অতএব প্রত্যেক আহমদীর এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত যে, সে নিজেও এবং তার স্ত্রী-সন্তানরাও যেন কুরআন মজীদ পড়া ও তিলাওয়াত করার প্রতি মনোযোগ দেয়। তারা যেন অনুবাদ পড়ে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীর পড়ে, খলীফাদের তফসীর,যেমনটি আমি বলেছি, কিছু রয়েছে, সেগুলো যেন পড়ে এবং শুনে। এর অডিও-ও রয়েছে এবং এমটিএ-তেও দেখানো হয়ে থাকে। যদি আমরা কুরআন মজীদকে এভাবে না পড়ি তাহলে আমাদের চিন্তা করা উচিত এবং প্রত্যেকের নিজের সম্পর্কে ভাবা উচিত যে, আমরা কি শুধু আহমদী হয়েই বয়আতের হক আদায় করে দিয়েছি, নাকি এখনও আমাদের সেই উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে যার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেছেন,এটা সত্য যে, অধিকাংশ মুসলমান কুরআন শরীফকে ত্যাগ করেছে, কিন্তু তবুও কুরআন শরীফের জ্যোতি, বরকত এবং প্রভাব সদা জীবন্ত ও সতেজ রয়েছে। অতএব আমি এই যুগে প্রমাণ দেওয়ার জন্য প্রেরি ত হয়েছি। তিনি (আ.) বলেন, আমি এখন প্রমাণ দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি আর আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা যথাসময়ে নিজ বান্দাদের স্বীয় সাহায্য ও সমর্থনের জন্য প্রেরণ করেছেন, কারণ তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (সূরা হিজর: ১০)। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা এই যিকর অর্থাৎ কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষক। " (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১১৬-১১৭)

অতএব প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা যা কিছু পাব, তা কুরআন শরীফের কল্যাণেই পাব এবং আমাদের এদিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"কুরআন করিম পরিত্যাগ করে সফলতা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব এবং অবাস্তব ব্যাপার, আর এভাবে সফলতা লাভ কেবল একটি কল্পনা মাত্র, যার সন্ধানে মানুষ ব্যস্ত রয়েছে। সাহাবাদের আদর্শের দিকে তাকাও, যখন তারা মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করলেন এবং ধর্মকে জাগতিকতার ওপরে প্রাধান্য দিলেন, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়ে গেল। শুরুতে বিরোধীরা ঠাট্টা-তামাশা করতো যে, এরা তো স্বাধীনভাবে বাইরে বেরও হতে পারে না অথচ তারা রাজত্ব লাভের দাবী করে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে বিলীন হয়ে তারা সেই জিনিস পেল যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের ভাগ্যে জোটে নি।" (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৭)

তাই এ বিষয়টি আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার যে, পবিত্র কুরআনই সেই শিক্ষা যা আমাদেরকে সফলতার শিখরে পৌঁছে দিবে আর এর দ্বারাই আমরা সফলতা লাভ করব, যদি আমরা এর শিক্ষা অনুযায়ী আমল করি এবং পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করি।

এক রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আবু মুসা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন: "ঐ মু'মিন, যে কুরআন পড়ে এবং তদনুযায়ী আমল করে, সে সেই ফলের মতো, যার স্বাদও ভালো এবং সুগন্ধও চমৎকার। আর সেই মু'মিন, যে কুরআন পড়ে না, কিন্তু তার ওপর আমল করে, (এদিক সেদিকের কথা শুনে তদনুযায়ী আমল করে) সে সেই খেজুরের মতো, যার স্বাদ মিষ্টি কিন্তু কোনো সুগন্ধ নেই। পক্ষান্তরে, যে মুনাফিক কুরআন পড়ে, সে সেই সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদের মতো, যার ঘ্রাণ সুগন্ধি কিন্তু স্বাদ তিতা। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে সেই তিক্ত ফলের মতো, যার স্বাদও তিতা এবং গন্ধও খারাপ।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আতইমা, হাদীস-৫৪২৭)

অতএব এই হাদীস স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, আমাদের কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত এবং তা বুঝে তদনুযায়ী আমল করাও আবশ্যক।

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

আর আমরা যখন এর ওপর আমল করব তখন এমন সুগন্ধিযুক্ত ফলের ন্যায় হতে পারবো যার স্বাদও চমৎকার এবং যার সগন্ধও মধুর। এ এক চমৎকার উপমা।

তাই আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মানুষের বৈশিষ্ট হলো, সুস্বাদু ও সুগন্ধিযুক্ত জিনিস, যা খেয়ে মানুষ পরিতৃপ্ত হয় তা বারবার খাওয়ার ইচ্ছা জাগে। এমনিভাবে পবিত্র কুরআন আমাদের বারবার পড়ার ও বুঝার আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত। আর আমরা যখন এরূপ করব তখন না কেবল নিজেরা উপকৃত হব, বরং আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের সমাজকেও এর দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত করতে পারব। অতএব এ ধরনের লোকেরাই তাকওয়ায় উন্নতি সাধন করে, এর ওপর আমলকারী, হেদায়েত লাভকারী আর এরা জগতের জন্য কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হয়। তাদের দ্বারা জগত কল্যাণমণ্ডিত হয়। তারা নিজেরাও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করে আর জগতকেও প্রশান্তি দান করে। এমন পিতামাতা সত্যিকার অর্থে নিজেদের সন্তানের অধিকারপ্রদানকারী হয়ে থাকে। তারা তাদের প্রতিবেশির অধিকারও প্রদান করে থাকেন। তারা জাগতিক কাজেও নিজ সমাজেও একে অন্যের অধিকার প্রদান করে থাকে। এভাবে জামা'তের ব্যবস্থাপনায় জামা'তের সেবা করে নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকে কেননা তারা সেই হেদায়েত অনুযায়ী আমল করছে– যা পবিত্র কুরআন তাদেরকে দান করেছে। এই ইবাদতকারীরা যথাযথভাবে ইবাদতও করে থাকে। আর যেভাবে আমি পূর্বে ও বলেছি যে, এমন পিতামাতা যখন সন্তানের সামনে উত্তম আদর্শ প্রদর্শ ন করে, তখন সন্তানরাও তাদেরকে আদর্শ মনে করে। স্ত্রীরা তাদেরকে নিজেদের আদর্শ মনে করে। এভাবেই সত্যিকারের তাকওয়াপূর্ণ মানুষ তৈরি হয়, যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং মানবতার জন্য কল্যাণকর ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। তাদের দ্বারা দুনিয়া উপকৃত হয়। তারা নিজেরাও প্রশান্ত জীবন যাপন করে এবং বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা ছড়িয়ে দেয়। এরকম বাবা–মা–ই প্রকৃত অর্থে তাদের সন্তানদের হক আদায় করেন। তারা তাদের প্রতিবেশীদের প্রতিও ন্যায়বিচার করেন। তারা নিজেদের পারিবারিক এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন। তেমনি তারা জামাতের ব্যবস্থাপনায়ও যথাযথ ভূমিকা রাখেন এবং আল্লাহর ইবাদতের হকও আদায় করেন। ফলে, এমন একটি পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা ধর্মপরায়ণ এবং নেক–কার্য সম্পন্ন পরিবেশে পরিণত হয়। আর তখনই আল্লাহর অনুগ্রহ ও বরকত অবিরাম বর্ষিত হতে থাকে।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার দাবী অনুযায়ী কুরআন করীমের শিক্ষা অনুযায়ী চলার মাধ্যমেই হেদায়াত লাভ সম্ভব। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যখন হেদায়াত লাভ হবে তখন তোমরা এমন এক সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখবে যার মাধ্যমে তোমাদের জীবনে এক মহা পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। সুতরাং এটি পাঠ করা, বুঝা ও এর শিক্ষা পালন করার দিকে আমাদেরকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যে এটুকু পুণ্য রাখে যে সে হয়তো ঘরে নিয়মিত কুরআন পাঠ করে না, অনুবাদ পড়ে না ও এটি নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করেনা, মহানবী (স.) বলেছেন, কিন্তু ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত দরস, বক্তৃতা প্রভৃতিতে অন্যের মুখে কুরআন শুনে, কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা, আদেশাবলি এবং এর শিক্ষার আলোকে যেসব আলোচনা অনুষ্ঠান হয়, সেসব শুনে ও সেগুলো পালনের চেষ্টা করে, তখন সে হয়তো সেই স্বাদ পায় না যা একজন কুরআনের পাঠক পেয়ে থাকে, কিন্তু কিছু না কিছু অংশ সে পায় এবং সেই সুগন্ধ থেকে উপকৃত হতে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য (কুরআন) পাঠ করে, সেটির উপর আমল করে না, সে এটি থেকে কোন লাভবান হয় না। আর যে ব্যক্তি না কুরআন পড়ে, না এর উপর আমল করে, তার জীবন তো চরম কপটতাময় জীবন। তার মুসলমান হবার কেবল মৌখিক দাবি রয়েছে কিন্তু সে মোটেও ইসলামের শিক্ষা পালন করছে না। কেননা ইসলামের শিক্ষা পালন কুরআনের শিক্ষা অর্জন ব্যতী ত অসম্ভব। কুরআন করীমের আদেশাবলির প্রতি গভীর অভিনিবেশ ব্যতীত অসম্ভব।সুতরাং এ বিষয়টিকে আমাদের অনেক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন যে আমাদেরকে কুরআন করীম পাঠ করতে হবে, এর উপর আমলও করতে হবে, যেন আমরা এর সুগন্ধ লাভ করতে পারি, সুগন্ধ বিস্তারকারীও হতে পারি। শুধু সুগন্ধ লাভকারীই নয়, বরং সুগন্ধ বিস্তারকারীও হতে পারি।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন,মহানবী (সা.) বলেছেন, লোকেদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহ্র পরিবারের সদস্য হয়ে থাকে। রাবী বলেন, তখন আমরা তাঁর (স.) নিকট জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল! খোদার পরিবারের সদস্য কারা? মহানবী (সা.) বললেন, কুরআন ওয়ালারা আল্লাহ্র পরিবারের সদস্য এবং আল্লাহ্র বিশেষ পছন্দনীয় বান্দা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কুরআন করীম পাঠকারী এবং এর উপর আমলকারী আল্লাহ্র পরিবারের সদস্য হয়ে থাকে।

(সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস–২১৫)

হযরত আকদস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন,

ঐসব লোকেরাই সফল হবে যারা কুরআন করীম অনুযায়ী জীবন যাপন করে। কুরআন করীমকে ত্যাগ করে সফলতা লাভ অসম্ভব এবং কল্পনাতীত বিষয়। আমিও বিগত কিছুদিন যাবত খুতবাসমূহে কুরআন করীম সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছি। ধারাবাহিকভাবে খুতবাতে বিস্তারিতভাবে সেসব কথা বলেছিলাম যা তিনি (আ.) আমাদের উদ্দেশ্য বলে গেছেন। এখানেও আমি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করছি। তিনি (আ.) বলেছেন, যদি সফলতা লাভ করতে চাও, তবে কুরআন করীম ব্যাতীত সেটি লাভ করা সম্ভব নয়। যদি মুসলমান হওয়ার দাবী থাকে আর কুরআন করীম হাতে না থাকে, কুরআন করীমের শিক্ষা পালন করা না হয়, তবে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কোন সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়।

সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর স্বীয় সাফল্য লাভের জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে দ্বীনও সুশোভিত হবে এবং দুনিয়াও লাভ হবে।

মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে যেসব ঝগড়া–বিবাদ রয়েছে, তারা পরস্পর একে অন্যকে হত্যা করছে, অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে, সরকার জনগনের সাথে লড়াই করছে, জনগন সরকারের সাথে লড়ছে, পরস্পর একে অন্যকে হত্যা, লুণ্ঠন হচ্ছে, সীমালঙ্ঘন হচ্ছে, এগুলো এজন্য হচ্ছে যে কুরআন করীমের উপর আমল নেই।

মৌখিকভাবে উভয়েই এ দাবিই করে যে, উভয়ের হাতেই কুরআন আছে কিন্তু উভয়ে কুরআন মজীদের শিক্ষা থেকে বহু দূরে। কুরআন মজীদের ওপর আমলকারী হলে এমন বিষয় সংগঠিত হতো না। এর ওপর আমল করার জন্য এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা যে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন, যে ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন , তাঁকে মান্য করতে তারা প্রস্তুত নয়। তারা যদি গ্রহণ না করে তবে সেই কল্যাণরাজি থেকে উপকৃতও হতে পারবে না যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হেদায়াত বা পথ নির্দেশনার জন্য প্রেরণ করেছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! কুরআন মজীদ কল্যাণরাজির প্রকৃত উৎস এবং মুক্তির আসল মাধ্যম। এটি তাদের নিজস্ব ভুল যারা কুরআন মজীদের ওপর আমল করে না। যারা আমল করে না তাদের মধ্যে একটি দল হলো তারা যারা এর প্রতি বিশ্বাসই রাখে না এবং তারা একে খোদা তা'লার কালাম (বা বাণী)ই মনে করে না। তারা তো বহু দূরে পড়ে রয়েছে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করে এটি আল্লাহ্ তা'লার কালাম বা বাণী আর মুক্তির আরোগ্যদায়ী ব্যবস্থাপত্র, তারা যদি এর ওপর আমল না করে তবে তা কতটা আশ্চর্যজনক এবং পরিতাপের বিষয়। তাদের মাঝে অনেকে তো এমন আছে যারা সারা জীবনে কখনো তা পাঠই করে নি। অতএব, এমন ব্যক্তি যে খোদা তা'লার কালাম বা বাণীর প্রতি এমন উদাসীন এবং ভ্রুক্ষেপহীন তার দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির ন্যায়, যে–ব্যক্তি জ্ঞাত যে, অমুক ঝর্ণা খুবই নির্মল, সুস্বাদু, শীতল এবং এর পানি বহু রোগের মহৌষধ ও আরোগ্যদায়ী আর এই জ্ঞান সম্পর্কে সে নিশ্চিত, কিন্তু এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এবং পিপাসার্ত হওয়া সত্ত্বেও আর বহু ব্যাধিগ্রস্ত হয়েও সে সেটির কাছে যায় না। অতএব, এটি তার কতই না দুর্ভাগ্য এবং অজ্ঞতা। তার তো উচিত ছিল সেই ঝর্ণায় মুখ রাখা এবং পরিতৃপ্ত হয়ে সেটির উপাদেয় এবং আরোগ্যদায়ী পানি উপভোগ করা। কিন্তু এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তা থেকে সে সেভাবেই দূরে রয়েছে যেভাবে একজন অজ্ঞ (দূরে থাকে)। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে দূরে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু এসে নিষ্কৃতি দেয়। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত অনেকেই বুঝতেই পারে না যে, কুরআন মজীদে কী কল্যাণ রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, সেই ব্যক্তির অবস্থা বড়ই শিক্ষণীয় এবং উপদেশ গ্রহণীয়। মুসলমানদের অবস্থা বর্তমানে এমনই হচ্ছে। তারা জানে যে, সকল সফলতার জন্য এই কুরআন মজীদই আছে যার ওপর আমাদের আমল করা উচিত। কিন্তু না, এর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপও করা হয় না। এটি জানা সত্ত্বেও কুরআন মজীদের

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

যার মধ্যে ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের পরোয়া করেন না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Bibi & Jahanara Bibi From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

আদেশাবলির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। তিনি (আ.) আরো বলেন, এক ব্যক্তি যিনি একান্ত সহানুভূতি এবং হিতাকাঙ্ক্ষীতার সাথে (অর্থাৎ, নিজের দৃষ্টান্ত নিজেই প্রদান করছেন যে, আমি সহানুভূতি এবং হিতাকাঙ্ক্ষীতার সাথে) তোমাদের আহ্বান করছি আর আমার সহানুভূতিই নয় বরং খোদা তা'লার আদেশ এবং ঈমানিয়্যাতের সাথে এর দিকে আহ্বান করা হলে তাকে মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল বলা হয়। তিনি (আ.) বলেন, এই জাতির জন্য এর চেয়ে বেশি আর কী দয়নীয় অবস্থা সৃষ্টি হবে!"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৮১-১৮২)

তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানদের এটি উচিত ছিল আর বর্তমানেও তাদের জন্য এটি আবশ্যক যে, তারা যেন এই ঝর্ণাকে মহামর্যাদাবান নেয়ামত বা অনুগ্রহ জ্ঞান করে এবং এর মূল্যায়ন করে। এর মূল্যায়ন হলো, এর ওপর আমল করা আর এরপর দেখবেন খোদা তা'লা কীভাবে তাদের বিপদাপদ ও সমস্যাবলি দূর করে দেন।

হায়! মুসলমানরা যদি বুঝত এবং চিন্তা করত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য একটি পুণ্যের পথ সৃষ্টি করেছেন এবং তারা এর ওপর চলে উপকৃত হবে। অতএব, এটি সেই জিনিস, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছিলাম, মুসলমানদের মাঝে যেসকল মন্দ সৃষ্টি হচ্ছে তা একারণে সৃষ্টি হচ্ছে যে, তারা মানছে না এবং কুরআন মজীদের ওপর আমল করছে না। কুরআন মজীদকে তো তারা পরিত্যাগ করে রেখেছে, কেবল নামসর্বস্ব দাবি করছে। কেবল হাতে ধরে রেখেছে, ব্যবহারিক জীবনে তা পরিত্যাগ করেছে। আহমদীদের জন্য তারা কুরআন মজীদ নিষিদ্ধ করেছে যে, এটি (তারা) পাঠ করতে পারবে না। পাকিস্তানে কুরআন মজীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, পাঠ করতে পারবে না। তারা নিজেরাই এর ওপর আমল করে না। যদিও আমাদেরকে এটিই বলি কিন্তু তারা আমাদের হৃদয়ে কুরআনের যে শিক্ষা রয়েছে তা মুছে ফেলতে পারবে না। (তারা) শত চেষ্টা করেও আমাদের অন্তর থেকে এর (কুরআনের) ভালোবাসা (বিন্দু পরিমাণ) কমাতে পারবে না। অতএব, আমাদেরকে, বিশেষভাবে আহমদীদেরকে এ দিকে গভীর মনযোগ নিবদ্ধ করা আবশ্যক। আর তাদের এই কুরআনের শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া ও পরিত্যাগ করার কারণে এবং যারা বোঝায় তা না বোঝার কারণে তাদের কি পরিণতি তা তো আমরা (স্বচক্ষে) অবলোকন করছি। চারিদিকে অস্থিরতা, নৈরাজ্য বিরাজমান। সুতরাং, তাদের মনোনিবেশ করা উচিত, ভেবে দেখা দরকার আর যদি কুরআন করীমকে হেদায়াতের ঝরণাধারা মনে করে তবে এ সকল (কুরআনের) আদেশাবলি মান্য করা-ও আবশ্যক।

হযরত সোহায়েব (রা.) বর্ণিত একটি রেওয়ায়ে উল্লেখ রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে-ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে কার্যত বৈধ মনে করে তার কুরআনের প্রতি কোন ঈমান নেই।

(সুনান তিরমিযি, কিতাব ফাযাইলিল কুরআন, হাদীস-২৯১৮)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা যে বিষয় নিষিদ্ধ আখ্যায়িত করেছেন তার কোন গুরুত্ব দেয় না আর কুরআন করীমের যে সকল আদেশাবলি রয়েছে (তা) মান্য করে না এমন ব্যক্তি যতই (মুখে) বলুক না কেন আলহামদুলিল্লাহ্ আমরা মুসলমান, তাদের এমন ঈমান অন্তঃসার শূন্য, কেবলমাত্র মৌখিক দাবী আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেন না আর এমন লোকেরা অন্যদের ক্ষতিসাধন করতে থাকে কারণ (তারা) আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে চলে গেছে। (এরা) অন্যদের অধিকার হরণ করছে আমি যেমনটি উদাহারণ উপস্থাপন করেছি, বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা এমনই। বাদশা, (থেকে নিয়ে) নেতা-নেত্রী, বিভিন্ন ফিরকার লোকেরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত। এক মুসলমান অপর মুসলমানকে হত্যা করছে, কালেমার অনুসারীরা একে অপরকে হত্যা করছে। অতএব, এর থেকে উত্তরণের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, এই লোকেরা যেন কুরআন করীমের সঠিক শিক্ষা লাভ করতে পারে আর বর্তমান যুগে এই গুরুদায়িত্ব আহমদীদের ওপর বর্তায়। আহমদী মুসলমানদের (দায়িত্ব) হচ্ছে, তারা এর (কুরআনের শিক্ষার) ওপর আমল করবে যেন, অ-মুসলিম বিশ্ব তাদের কর্মকাণ্ড দেখে বুঝতে সক্ষম হয় যে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা কি এবং কুরআন করীমের শিক্ষা কি! যা শান্তি ও নিরাপত্তা এবং প্রেম -প্রীতি ও ভালোবাসার শিক্ষা, যা সমাজে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপনের শিক্ষা (আর) যা বান্দার অধিকার আদায়ের শিক্ষা। তাই আহমদী মুসলমানদের এদিকে গভীর মনযোগ দেওয়া উচিত।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

অতিথিকে গৃহের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানানোও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun, From Mirza Enayetulla Sb Harhari, Murshidabad

রমযান মাসে কুরআন করীম পাঠের সময় এসব বিষয়ের প্রতি-ও দৃষ্টিপাত করুন এবং এই শিক্ষাকে নিরন্তর ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সারা বছর আমাদেরকে চেষ্টাপ্রচেষ্টা করতে থাকতে হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, জিবরাইল মহানবী (সা.)-র নিকট এসে বলেন- অচিরেই অনেক নৈরাজ্য দেখা দেবে। সেই সকল ফিতনা থেকে মুক্তি লাভের কি উপায় হবে তিনি (সা.) জানতে চান হে জিবরাইল!। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তিনি (জিবরাইল) বলেন- নৈরাজ্য থেকে মুক্তির উপায় হলো আল্লাহ্র কিতাব।

(তিরমিযি, কিতাব ফাযাইলিল কুরআন, হাদীস-২৯০৬) (জামিউল ওয়াসুল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৬)

সুতরাং, আমি যেভাবে ইতোপূর্বে বলেছিলাম- আমাদেরকে আমাদের নিজেদেরকে এবং নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষার্থে আল্লাহ্ তা'লার কিতাবের মনযোগী হওয়া আবশ্যক (আর) তখনই আমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হবো এবং নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা থেকে বাঁচতে পারবো। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য যেসকল আদেশাবলি অবতীর্ণ করেছেন পরিষ্কারভাবে বুঝতে সক্ষম হবো।

মহানবী (সা.) একবার বলেন- প্রকাশ্যে কুরআন করীম পাঠকারী, প্রকাশ্যে সদকা প্রদানকারীর মত আর গোপনে কুরআন করীম পাঠকারী, গোপনে সদকা প্রদানকারীর অনুরূপ।

(সুনান তিরমিযি, কিতাব ফাযাইলিল কুরান, হাদীস-২৯১৯)

সুতরাং, আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এটি-ও রেওয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, সদকা বালা-মুসিবত, বিপদাপদ ও নৈরাজ্য দূর করে দেয় (আর) এগুলো টলিয়ে দেয়। (সুনান তিরমিযি, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-৬৬৪)

অতএব, পবিত্র কুরআন পাঠ করা আর এমনভাবে পাঠ করা যদ্বারা তা ভালোভাবে বুঝা যায়, তবে এটি সদকা হিসেবে গৃহীত হবে আর এর কল্যাণে সকল নৈরাজ্য থেকে মানুষ রক্ষা পাবে।

সুতরাং যেহেতু বর্তমানে পৃথিবী সবদিক থেকে পাপে নিমজ্জিত এবং ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা ঘেরাও করে রেখেছে; আমাদের এই সদকা সর্বদা অব্যাহত রাখা উচিত যে, পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত সর্বদা করতে থাকি; প্রকাশ্যেও, গোপনেও। আর নিজেদেরকে সেসব পরীক্ষা ও বিপদাবলি থেকে সুরক্ষিত রাখি এবং আল্লাহ্ তা'লা যে শিক্ষা দিয়েছেন সেটার ওপর আমল করি।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, শুধুমাত্র দুজন ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের ব্যাপারে হিংসা অর্থাৎ এমন ঈর্ষা করা যা ক্ষতি করার জন্য হয় না, বরং প্রশংসার রূপে হয়, সেটা বৈধ। এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন দিয়েছেন এবং সে রাতদিন সেটি তিলাওয়াত করে। আর ঈর্ষাকারী বলে, হায়! যদি আমাকেও এমন জিনিস দেওয়া হতো যা তাকে দেওয়া হয়েছে! তাহলে আমিও সেটাই করতাম যেটা সে করছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা ধন সম্পদ দিয়েছেন যেটি সে সেখানে ব্যয় করে যেখানে ব্যয় করা উপযুক্ত। এতে ঈর্ষাকারী বলে, হায়! যদি আমাকেও এমন বিষয় দেওয়া হতো যা তাকে দেওয়া হয়েছে তাহলে আমিও সেটাই করতাম অর্থাৎ, আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করা।

(সহীহ বুখারী, কিতাব ফাযাইলিল কুরআন, হাদীস০-৫০২৬)

অতঃপর পবিত্র কুরআন পাঠ করার ব্যাপারে কিছু আদব রয়েছে। যারা ঈর্ষা করে কুরআনের পাঠকের ব্যাপারে সে জানে যে এই ব্যক্তি যা কিছু পড়ছে সেটার ওপর আমলও করছে। অপর ব্যক্তি যে শুনছে। এতেই তার মনে ঈর্ষা জন্ম নেয় যে, হায়! যদি আমিও পবিত্র কুরআনকে এভাবে বুঝতাম এবং এর ওপর আমল করতাম।

একইভাবে যেভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ধন-সম্পদের ব্যাপারে, এই বিষয়েও প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করে দিই, কিছু লোক বলে চাঁদার কী প্রয়োজন?

আল্লাহ্ তা'লা তো বলেন, পবিত্র কুরআনে ই বলেছেন, আর্থিক কুরবানী কর এটি জরুরী। তিনি (সা.) বলেছেন, তার প্রতি লোকেরা ঈর্ষা করে যে আর্থিক কুরবানী করে। তাই এটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন আমরা মনোযোগ সহকারে পবিত্র কুরআন পাঠ করবো তখন এই প্রশ্ন যা কিছু লোকের মনে উদয় হয় যে, আমাদের কেন আর্থিক কুরবানী করতে বলা হয়, তাদের প্রশ্নের উত্তর তারা পেয়ে যাবে। কেন বলা হয়? এটি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ। মহানবী (সা.) এক স্থানে বলেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন সুললিত কণ্ঠে এবং শুদ্ধভাবে পাঠ করে না তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুত তাফরী, হাদীস-১৪৬৯)

তাই সুললিত কণ্ঠে পাঠ করা এবং শুদ্ধভাবে পাঠ করা, ধীরে ধীরে পাঠ করা, বুঝে পাঠ করা এটিও জরুরী।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, মানুষের উচিত যেন পবিত্র কুরআন অধিক হারে পাঠ করে। এতে দোয়ার স্থান আসলে দোয়া করে। এটি

শুদ্ধভাবে পাঠ করার ব্যাখ্যা, যেখানে দোয়ার স্থান আসে সেখানে দোয়া করে। এই দোয়াতে যা চাওয়া হয়েছে নিজেও সেটাই চায়। পবিত্র কুরআনে দোয়াসমূহ আসলে সেসব স্থানে দোয়া করে এবং এসব দোয়াতে আল্লাহ্ তা'লা থেকে যা চাওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে অসংখ্যা দোয়া রয়েছে যেটি নবীগণ করেছেন। তাই বলেছেন, সেখানে মানুষ নিজেও যেন আল্লাহ্ তা'লাকে বলে, আমাকে এটি দাও। আবার তিনি (আ.) বলেন, যেসব স্থানে আযাবের কথা রয়েছে সেখানে এটা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এবং সেসব অপকর্ম থেকে বিরত হয় যার কারণে সেই জাতি ধ্বংস হয়েছিলো।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৬৫-২৬৬)

জাতিসমূহের ধ্বংসের উল্লেখ রয়েছে যে, কোন কোন পাপকর্মের কারণে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পাকড়াও করেছেন। যখন এমন স্থান আসে তখন মানুষ যেন ইস্তিগফারও করে এবং বাঁচার চেষ্টা করে। যখন আমরা এমন করবো তখন অসংখ্য অপকর্ম থেকে আমরা নিজেরাই সুরক্ষিত হতে থাকবো।

অধুনাকালের পরিবেশে এই পশ্চিমা পরিবেশে এর প্রভাবে আমাদের মস্তিষ্কেও ভ্রান্ত বিষয় সৃষ্টি হয়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমা সংস্কৃতি আমাদের মস্তিষ্কের ওপরেও নেতিবাচক প্রভাব রাখছে। আমাদের মাঝে অনেক মানুষ নোংরা বিষয়ে জড়িয়ে পড়ছে। আমরা যখন পবিত্র কুরআন পাঠ করবো, ইস্তেগফার করবো এবং মন্দ বিষয় থেকে বঁ াচার চেষ্টা করবো তখন আমাদের জীবন সুন্দর হবে। আমরা এই নোংরামি থেকে বাঁচতে পারবো। তিনি (আ.) বলেন, সেসব মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকো যার কারণে পূর্ববতী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়েছিল।

তিনি (আ.) বলেন, এক উচ্চতর পরিকল্পনা- যার সাথে ওহীর সম্পর্ক নেই। এগুলোকে মানুষ আল্লাহর কিতাবের সাথে মিলায় কিন্তু এগুলো ব্যক্তি বিশেষের মতামত যা কখনো কখনো মিথ্যাও হতে পারে। আবার এমন মতামতের বিরোধিতা হাদীসেও বিদ্যমান ফলে সেগুলো বানোয়াট বলে বিবেচিত হবে। প্রথা সর্বস্ব বিষয় থেকে বিরত থাকা উত্তম। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে শরীয়তে অবৈধ পরিবর্তন সূচিত হয়। অতএব উত্তম পদ্ধতি হলো, যে সময় এমন ওজীফা পাঠ করায় ব্যয় করবে সেই সময়ে কু রআনে মনোনিবেশ করো। যেসব মানুষ বলে- ওজীফা পড়তে হবে, অমুক ওজীফা পড়ো। তিনি (আ.) বলেন, উত্তম হলো তোমরা কুরআন পড়ো এবং এর ওপর মনোনিবেশ করো। মানুষ বলে- কীদোয়া করবো? কি ওজীফা পড়বো? অতএব তঁ ার (আ.) নির্দেশনা হলো, পবিত্র কুরআনে মনোনিবেশ কর এর ফলে তুমি যাবতীয় মন্দকর্ম ও খারাপ বিষয় থেকে এবং কষ্ট থেকে বেঁ চে যাবে। তোমরা আল্লাহ তা'লা প্রদত্ত হেদায়াতের জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। আল্লাহ তা'লার নির্দেশনা সম্পর্কে জানতে পারবে। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআন মহানবী (সা.) এর ওপর বিশেষ ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন। এছাড়া যদি কোনো মতামত থেকেও থাকে তাহলে তা ভুলও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। সে যতই বুদ্ধিবৃত্তিক কথাবার্তা বলুক না কেন। মানুষ মাঝে মাঝে কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক কথা বলে থাকে আর সেগুলো পবিত্র কুরআনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু সেগুলো তেমন স্পষ্ট হয় না যেভাবে পবিত্র কুরআন করে থাকে , কেননা সেগুলো ওহী হিসেবে নাযিল হয় নি। ফলে সেগুলো মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হয় এবং সেগুলো মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, যদি হৃদয় কঠোর হয়ে যায় তাহলে কোমল করার উদ্দেশ্যে বারবার পবিত্র কুরআন পড়ুন। যেখানে যেখানে দোয়া করা আছে সেখানে মুমিনের মনও চায়-হায়! আল্লাহ যদি এই ঐশী অনুগ্রহে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করতেন। পবিত্র কুরআনের দৃষ্টান্ত একটি বাগানের মতো। এক জায়গায় মানুষ কোন ধরণের ফল চায় আর একটু সামনে এগিয়ে অন্য আরেক ধরনের ফল চায়।

অতএব, সকল ক্ষেত্রের উপযোগী কল্যাণ অনুসন্ধান করা উচিত। নিজের পক্ষ থেকে কথা কেন বলতে হবে। নতুবা প্রশ্ন হবে তুমি কেন নতুন এক ধরণের বিষয় সংযোজন করেছ? কুরআনের যে শিক্ষা রয়েছে তার ওপর আমল করো। নতুন নতুন প্রথার প্রচলন করো না। পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সাথে নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করো না। তিনি (আ.) বলেন, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কার এই কথা বলার অধিকার আছে যে, অমুক রাতে যদি সূরা ইয়াসিন পাঠ করো তাহলে কল্যাণ লাভ করবে নতুবা লাভ করবে না।" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৬৬)

যারা বলে যে, অমুক সূরা এভাবে পড়লে কল্যাণ লাভ করবে, অমুক সময়ে পড়লে কল্যাণ লাভ করবে, এভাবে না পড়লে কল্যাণ লাভ হবে না। অতএব তিনি (আ.) বলেন, এ সকল কথা ভুল। এটি তো আল্লাহর বাণী। যেভাবেই পড়বে- বুঝে পড়লে, এর ওপর আমল করার উদ্দেশ্যে পড়লে, সৎ উদ্দেশ্যে পড়লে কল্যাণই কল্যাণ।

অতএব আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত- আমরা কি এভাবে পড়ি? কত আদেশের ওপর আমরা আমল করি? কতো দোয়া এমন আছে যেগুলো সামনে আসলে আমরা সেগুলো নিজের জন্য যাচনা করার চেষ্টা করি। কতো এমন মন্দকর্ম ১১আছে যেগুলো থেকে বাঁ চার আদেশ যখন উল্লেখ করা হয় তখন সেগুলো থেকে আমরা বঁ াচার দোয়া করি। অতএব যদি আমরা এভাবে করি তাহলে কেবল আমরা পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষার কল্যাণ লাভ করতে পারব।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, "আমি বার বার এবং জোরালোভাবে বলছি যে, কুরআন এবং মহানবী (সা.) এর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসার সম্পর্ক রাখা এবং প্রকৃত আনুগত্য করা একজন মানুষকে সম্মানের অধিকারী বানিয়ে দেয়। "

(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

তিনি (আ.) বলেন, কুরআন করীমে গভীর মনোনিবেশ করো। এর মাঝেই সব কিছু নিহিত। এর মধ্যে পূণ্য এবং মন্দ বিষয়াবলির ব্যাখ্যা রয়েছে এবং ভবিষ্যত কালের বিভিন্ন ভবিষ্যদবাণী আছে। ভালোভাবে অনুধাবন করো যে, এটি এমন এক ধর্মকে উপস্থাপন করে যার ওপর কোন আপত্তি হতেই পারে না। কেননা এর কল্যাণ ও সুফল সবসময় সজীব ও যুগোপযোগী।" (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১২২)

তিনি (আ.) বলেন, এই গৌরব শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনেরই কেননা আল্লাহ তা'লা এর মধ্যে সর্বরোগের চিকিৎসাপত্র বর্ণনা করেছেন। সকল ইন্দ্রীয় শক্তিকে লালন পালন (সক্রিয়) করেছেন এবং সব´প্রকার মন্দকাজ সম্পর্কে বর্ণনা করার পর তা প্রতিহত করার উপায়ও বর্ণনা করে দিয়েছেন। এজন্য নিয়মিত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করো এবং দোয়া করো আর নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী পরিচালনার চেষ্টা করো।নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, "কুরআন করীম তেলাওয়াত করো আর খোদার বিষয়ে কখনও হতাশ হবে না। একজন মুমিন তার খোদা সম্পর্কে কখনও হতাশ হয় না। এটা কাফেরদের স্বভাব যে তারা খোদা তা'লার বিষয়ে হতাশ হয়ে যায়। আমাদের খোদা হচ্ছেন সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান খোদা। কুরআন করীমের অনুবাদও পড়ো আর নামাযকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আদায় করো আর তার (নামাযের) প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করো। আর নিজ ভাষাতেও দোয়া করো। কুরআন করীমকে কোন (বাহ্যিক) সাধারণ পুস্তক হিসেবে পাঠ করবে না বরং সেটিকে খোদা তা'লার ঐশীবাণী হিসেবে পাঠ করো"।(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৭-৫৮)

সুতরাং এগুলো সেসব বিষয় যেগুলোর ওপর একজন মুমিনের আমল করা উচিত। আর যখন আমরা এভাবে আমল করব তখন আমরা আল্লাহ তা'লার কৃপায় কুরআনের শিক্ষা থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারবো। নিজেদের জীবন গড়তে পারবো। নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবনও সঠিকভাবে গড়তে পারবো। আর যখন এমনটি ঘটবে তখনই আমরা সেই উদ্দেশ্য অর্জনকারী বলে সাব্যস্ত হব যা আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আর আমাদের জীবন সফল হবে আর ভবিষ্যত প্রজন্মও সফলতার সাথে জীবন অতিবাহিত করবে।

আর রমযানের এই দিনগুলোতে যখন আমরা বিশেষভাবে কুরআনের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছি তাই পাশাপাশি এই প্রতিজ্ঞাও করুন যে, আমরা এই মনোযোগ অব্যাহত রাখব। আর সবসময় কুরআন করীম পড়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিব। এর ওপর আমল করার ক্ষেত্রেও বিশেষ দৃষ্টি দিব এবং নিজেদের সন্তানেদেরকে (কুরআন) পড়তে উপদেশ দিব। এমন যেন না হয় যে একবার আমিন পড়ানোর পর কাজ শেষ হয়ে যাবে। না, বরং এখন (কুরআন শিখার পর) করআন করীম আমাদের জন্য এমন একটি পুস্তক যা আমাদের হেদায়াতের মাধ্যম। আর আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আর তাকওয়ার পথে পরিচালিত করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গীন জীবনব্যবস্থা। আর যখন এমনটি ঘটবে তখন আমাদের জীবন সব সময় সফল হবে।

আল্লাহ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন যাতে এই রমযান মাসে যখনই এর (কু রআন) তেলাওয়াত করি তখন তা বুঝারও চেষ্টা করি। আর এর ওপর আমল করার প্রতিজ্ঞা করি। আর ভবিষ্যতেও এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে থাকি এবং সারা বছর এটিকে (কুরআন) নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করি। (আমিন)

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৪ এপ্রিল, ২০২৫)

****

যুগ ইমামের বাণী

যার মধ্যে ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের পরোয়া করেন না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Bibi & Jahanara Bibi From- Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: সিরিয়ার এক ভদ্রলোক শেয়ার ও স্টক মার্কেটের কেনাবেচায় সুদের উপাদান থাকা এবং এ বিষয়ে নিজের গবেষণার কথা জানিয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) কে চিঠি লেখেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২১ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর তারিখের চিঠিতে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে লেখেন-

গবেষণা করা ভাল। আপনি অবশ্যই এ বিষয়ে নিজের গবেষণা করে আমাকে রিপোর্ট পাঠান। আর যতদূর বর্তমান যুগে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিয্যে সুদের উপাদান থাকার প্রসঙ্গটি রয়েছে, তবে এবিষয়টি বুঝতে হলে এই যুগের 'হাকাম ও আদাল' (ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিম্নোক্ত নির্দেশকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। হুযুর (আ.) বলেন, 'দেশে এখন অধিকাংশ বিষয় ওলট পালট হয়ে গেছে। সমস্ত ব্যবসায় কিছু না কিছু সুদের অংশ রয়েছে। অতএব, বর্তমান যুগে নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।'

(আল বদর, নম্বর-৪১-৪২, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮ই নভেম্বর, ১৯০৪)

এরপর এক স্থানে সুদের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- 'শরিয়তে সুদের পরিভাষায় বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি লাভের জন্য অপর ব্যক্তিকে টাকা ধার দেয় আর এবং লাভ ধার্য করে নেয়। এই পরিভাষা যেখানে পূর্ণ হবে সেটিকেই সুদ বলা হবে। কিন্তু যে টাকা নিয়েছে, সে কোনও অঙ্গীকার বা চুক্তি না করে নিজের পক্ষ থেকেই বেশি দেয়, তবে সেটি সুদের আওতার বাইরে। সেই কারণেই আম্বিয়াগণ শর্তকে বাইরে রেখেছেন। যদি বাদশাহ কোনও টাকা পয়সা নেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বেশি দেন আর যে ব্যক্তি দিচ্ছে সে যদি এই উদ্দেশ্য নিয়ে না দেয়,তবে সেটিও সুদের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটি বাদশহার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ।খোদা তা'লার পয়গম্বর কারো কাছে এমন ঋণ গ্রহণ করেন নি, যা পরিশোধের সময় তিনি কিছু না কিছু অবশ্যই দেন নি। এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যে, এর জন্য বাসনা যেন না থাকে। আকাঙ্খার বিপরীতে যা কিছু অতিরিক্ত লাভ হয় তা সুদের গণ্ডিভুক্ত নয়। "

(আল বদর, ১০নম্বর, ২য় খণ্ড, ২৭ শে মার্চ, ১৯০৩)

অতএব, ইসলাম যে সুদ নিষেধ করেছে সেটি হল এই যে, মানুষ যখন কাউকে এই উদ্দেশ্যে ঋণ দেয় যে, পরিশোধের সময় বেশি অর্থ লাভ করবে। কিন্তু যদি ঋণগ্রহণকারী নিজের পক্ষ থেকে কিছুটা বেশি দেয় তবে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এছাড়াও বর্তমান যুগে ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রায় প্রত্যেক জাগতিক ব্যবসাবাণিয্যের ক্ষেত্রে অপরিহার্য অংশ। আর পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কোনও না কোনও প্রকারের সুদের উপাদান থাকে যা তাদের ব্যবসার অংশ হয়ে থাকে। এই কারণেই হুযুর (আ.) বলেছেন, সমস্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু না কিছু অংশ সুদের অংশ থাকে। এই কারণে বর্তমান যুগে নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

এমতাবস্থায় মানুষ যদি খুব বেশি বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে থাকে তাদের জীবনযাপনই দুরূহ হয়ে উঠবে। কেননা সাধারণ জীবনে যে কাপড় চোপড় আমরা পরে থাকি সেই কাপড়ের ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলিতেও কোনও না কোনওভাবে সুদের অর্থ বিনিয়োগ থাকে। আমরা যে রুটি খায়, সেই রুটির ব্যবসাতেও নিশ্চয় কোথাও না কোথাও সুদের টাকার সংমিশ্রন থাকে। মানুষ যদি এই সমস্ত জাগতিক চাহিদাবলী ত্যাগ করে নিজের বাড়িতেই বসে থাকতে চাই, যা বাহ্যত অসম্ভব, তবুও সেই বাড়িটি যে ইট, বালি ও সিমেন্ট দিয়ে তৈরী হয়েছে, সেই সব জিনিস প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলির ব্যবসায় কোথাও না কোথাও সুদের টাকার সংমিশ্রন থাকে।

তাই খুব বেশি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এবং সংশয়ে নিপতিত হয়ে নিজের জন্য অকারণ সমস্যা তৈরী করা উচিত নয়। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে,হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন-

' কিছু মানুষ নিবেদন করল, হে রসুলুল্লাহ্! একটি জামাত আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। আমরা জানি না যে তারা (সেটিকে জবেহ করার সময়) তার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে কি না। একথা শুনে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমরা গোশত-এর উপর আল্লাহ্‌র নাম (বিসমিল্লাহ) পাঠ করে খেয়ে নিও।'

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর সমীপে নিবেদন করা হয় যে, হিন্দুদের হাতের খাবার খাওয়া কি সঠিক? তিনি (আ.) বললেন, 'শরিয়ত এটিকে 'মুবাহ' (অপছন্দনীয়) হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এমন বিধিনিষেধের উপর শরিয়ত ততটা জোর দেয় নি। আঁ হযরত (সা.) আর্মেনীয়দের হাতে তৈরী খাবার খেয়ে নিতেন আর তা ছাড়া উপায়ও থাকে না।'

(আল হাকাম, নম্বর-১৯, ৮ম খণ্ড, ১০জুন, ১৯০৪)

অনুরূপভাবে লাহোরের ক্লার্ক ও সরকারি অফিসের উকিল হযরত মুনশি মহম্মদ হোসেন সাহেব এর নামে ১৯০৩ সালের ২৫ শে নভেম্বর তারিখে লেখা এক চিঠিতে হুযুর (আ.) লেখেন- আপনি আপনার বাড়িতে বুঝিয়ে দিন যে, এভাবে সন্দেহে নিপতিত হওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এমন প্ররোচনা জোগানো শয়তানের কাজ। কোনওমতেই প্ররোচনায় পা দেওয়া উচিত নয়। এটি পাপ। আর স্মরণ থাকে যে, সন্দেহের কারণে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায় না। আর সন্দেহের কারণে কোনও বস্তু অপবিত্রও হতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে অবশ্যই নামায পড়া উচিত। আর আমি দোয়াও করব ইনশাআল্লাহ। আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ 'সুচিবাই'এর মত সব সময় কাপড় পরিষ্কার করতেন না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- হযরত আয়েশা (রা.) বলেন কাপড়ে বীর্যপাত হলে সেটি শুকিয়ে যাওয়ার আমরা শুধু ঝেড়ে নিতাম। কাপড় ধুতাম না। আর এমন কুয়োঁর পানি খেতাম যাতে ঋতুবতী মেয়েদের ব্যবহার করা কাপড় পড়ে থাকত। বাহ্যিক পবিত্রতা দিয়ে সাধারণ অবস্থার সঙ্গে আপোষ করতাম। খৃষ্টানদের হাতে তৈরী পনীর খেয়ে নিতাম, যদিও বলা হত যে এতে শূকরে চর্বি মেশানো থাকে। মূলনীতি হল, যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস না সমস্ত জিনিসই পবিত্র। কেবল সন্দেহের কারণে কোনও বস্তু অপবিত্র হয় না।"

(আখবার আলফযল, কাদিয়ান দারুল আমান, নম্বর-৬৬, খণ্ড-১১)

অতএব, মানুষের উচিত সন্দেহ ও সংশয়ে নিপতিত না হয়ে তাকওয়া অবলম্বন করার মাধ্যমে নিজেদের ও ধর্মের বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা এবং যেখানে সরাসারি কোনও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বা কোনও নিষিদ্ধ বস্তু স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, তা থেকে যে কোনও ভাবে বিরত থাকা উচিত। এ বিষয়ে হুযুর (সা.)-এর আরও একটি হাদীস আমাদের সুন্দর পথপ্রদর্শন করে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন-

" নবী করীম (সা.)কে যখন দুটি বিষয়ের মধ্যে ক্ষমতা দেওয়া হল তখন তিনি সহজ বিকল্পটি বেছে নেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা পাপে পর্যবসিত না হয়। যদি তা পাপের কথা হত তবে তিনি তা থেকে অনেক দূরে থাকতেন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কখনও নিজের জন্য কারো কাছে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি, যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বিষয়গুলির বিরুদ্ধাচরণ না হয়েছে আর তিনি আল্লাহ্ জন্য প্রতিশোধ নিয়েছেন।

(বুখারী, কিতাবুল হুদুদ)

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিষয়েও বর্ণিত হয়েছে যে, একবার আমেরিকা ও ইউরোপের বিস্ময়কর সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কথা উল্লেখ করা হয়। এরই মাঝে একটি কথার উল্লেখ করা হয় যে, দুধ এবং সুপ যা টিনের বাক্সে প্যাকিং হয়ে বিদেশ থেকে আসে তা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত। আর এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এগুলি মোটেই হাত দিয়ে স্পর্শ করা হয় না । দুধও দোহন করা হয় মেশিনের সাহায্যে। একথা শুনে হুযুর (আ.) বললেন, 'যেহেতু নাসারা জাতি বর্তমানে এমন এক জাতিতে পরিণত হয়েছে যারা ধর্মের সীমানা এবং এর হালাল ও হারামের বিষয়ে কোনও পরোয়া করে নি আর এতে ব্যাপকহারে শূকরের মাংস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর যারা জবেহ করা তারা মোটেই খোদার নাম উচ্চারণ করে না। আর যেনটি শোনা যাচ্ছে, এক ঝটকায় পশুদের মুন্ডু পৃথক করে দেওয়া হয়। তাই সন্দেহ তৈরী হতে পারে বিস্কুট ও দুধ ইত্যাদি যা কিছু সেই সব কারখানায় তৈরী হয় তাতে শূকরের চর্বি এবং শূকরের দুধের ভেজাল আছে। সেই কারণে আমার মতে বিলেতি বিস্কুট এবং এই ধরণের দুধ ও সুপ ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে তাকওয়ার পরিপন্থী এবং অবৈধ। বিলেতে যেভাবে শূকর পালন ও ভক্ষণ বহুল প্রচলিত, সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে বিশ্বাস করব যে অন্যান্য যে সব খাদ্যদ্রব্য তারা প্রস্তুত করে এদেশে পাঠায় তাতে শূকরের কোনও না কোনও অংশ নেই?

রেঙ্গুনের ব্যবসায়ী আবু সাঈদ সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, রেঙ্গুনে ইংরেজদের বিস্কুট

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

এবং ডবল রুটি তৈরীর একটি কারখানা ছিল। একজন মুসলমান ব্যবসায়ী সেই কারখানাটি প্রায় দেড় লক্ষ টাকায় কিনে নেয়। যখন সেই ব্যবসায়ী হিসাবপত্রের খাতা যাচাই করে দেখে বুঝতে পারে যে, শূকরের চর্বিও ঐ কারখানায় কেনা হত। জিজ্ঞাসাবাদ করলে কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায় যে, তারা বিস্কুট তৈরীর কাজে তা ব্যবহার করত। কেননা, এটা ব্যবহার না করলে বিস্কুট সুস্বাদু হয় না আর বিদেশেও এই চর্বি এই সব খাদ্যে প্রয়োগ করা হয়।

এই ঘটনা শোনার পর পাঠকগণ অনুধাবন করতে পারে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর দৃষ্টি কতটা তাকওয়া এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি নির্ভর ছিল। কিন্তু যেহেতু আমাদের মধ্য থেকে অনেকে এমনও ছিল যারা প্রায় সফর করে থাকে এবং অনেকে আফ্রিকার প্রত্যন্ত গ্রাম ও গঞ্জে এখনও রয়েছে যাদের এই ধরণের দুধ ও বিস্কুটের প্রয়োজন হতে পারে। তাই তাদের বিষয়টিও দৃষ্টিতে রেখে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। এছাড়া ভারতবাসীর খাদ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, তারাও বাসনপত্র অত্যন্ত নোংরা করে রাখে। আর প্রায় তাদের কড়াই কুকুরে এসে চাটে। হুযুর (আ.) বলেন- 'আমার মতে নাসারাদের সেই সব খাদ্য হালাল যেগুলিতে কোনও সংশয় থাকে না আর কুরআন করীমের দৃষ্টিতে যেগুলি হারাম নয়। অন্যথায় এর অর্থ এটাই দাঁড়াবে যে, কিছু বস্তুকে হারাম মনে করে বাড়িতে খেলাম না ঠিকই , কিন্তু বাইরে খৃষ্টানদের হাতে খেয়ে নিলাম আর খৃষ্টানদের উপরেই নির্ভর হয়ে পড়লাম। একজন মুসলমানও যদি সন্দেহপূর্ণ অবস্থায় থাকে তবে তার খাবারও খাওয়া যায় না। যেমন-একজন মুসলমান, যে কিনা উন্মাদ এবং হালাল ও হারামের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, সেক্ষেত্রে তার খাবার বা তৈরী করা বস্তুর উপর কিভাবে ভরসা করা যেতে পারে? এই কারণেই আমরা বাড়িতে বিলেতি বিস্কুট ব্যবহার করি না বরং ভারতের হিন্দু কোম্পানির কাছ থেকে ক্রয় করি।

খৃষ্টানদের তুলনায় হিন্দুদের বিষয়টি নিরুপায়তার, কেননা এরা ব্যাপকহারে আমাদের মধ্যে মিলেমিশে গেছে আর সর্বত্র তাদেরই দোকান চোখে পড়ে। যদি মুসলমানদের দোকান থাকে আর যাবতীয় সামগ্রী সেখানে পাওয়া যায় তবে খাদ্যদ্রব্য তাদের (হিন্দুদের) থেকে কেনা উচিত নয়। "

(আল বদর, নম্বর-২৭, ৩য় খণ্ড, ১৬ই জুলাই, ১৯০৪, পৃ: ৩)

অতএব, সারাংশ এই যে, অতিরিক্ত সংশয়ে পড়ে অকারণ বৈধ জিনিস ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত নয়, আবার বেপরোয়াভাবে প্রত্যেক বৈধ ও অবৈধ বস্তু ব্যবহার করার চেষ্টাও করা উচিত না। বরং একটা সঙ্গত ও বিধিবৎ সীমাপর্যন্ত যাচাই বাছাই করে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন: একজন মহিলা পবিত্র রমযানের এ'তেকাফ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন যে, বাড়িতে এ'তেকাফে বসা যায় কিনা এবং তিনদিনের জন্য এ'তেকাফে বসা যায় কিনা? হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৯ আগস্ট ২০১৫ তারিখের পত্রে এই মাসলার নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

উত্তর: হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, রমযান মাসের মসনূন (বা সুন্নত) এ'তেকাফের যতটুকু সম্পর্ক তা তো পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত যে, বাড়িতে বসা যায় না আর তিনদিনের জন্যও হতে পারে না। মহানবী (সা.)-এর সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত হয়, মহানবী (সা.) পবিত্র রমযানে কমপক্ষে দশদিন এবং মসিজদে এ'তেকাফে বসতেন। অতএব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমৃত্যু রমযানের শেষ দশদিন এ'তেকাফ করতেন।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল এ'তেকাফ)

একইভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা যেখানে রমযানের মাসলা-মাসায়েল বর্ণনা করেছেন সেখানে এ'তেকাফ সম্পর্কে নির্দেশনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

রমযানের এ'তেকাফের (সময়) প্রথমত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের (মিলনের) অনুমতি নেই আর দ্বিতীয়ত এ'তেকাফের বসার জায়গা হল, মসজিদ বিভিন্ন হাদীসেও এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে যে, রমযানের এ'তেকাফ মসজিদেই বসা যেতে পারে। অতএব এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন,

(সুনান আবী দাউদ, কিতাবুস্ সওম)

অর্থাৎ, এ'তেকাফকারীর জন্য সুন্নত হল, সে কোনো রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না এবং তার সাথে সহবাস করবে না আর একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না, রোযা না রাখলে এ'তেকাফ হবে না এবং জামে মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও এ'তেকাফ করা যথার্থ নয়।

কাজেই, পবিত্র কুরআন মহানবী (সা.)-এর হাদীস মোতাবেক পবিত্র রমযানের মসনূন (সুন্নত) এ'তেকাফ কমপক্ষে দশদিন আর এজন্য মসজিদেই বসা হয়।

তবে, রমযান ছাড়া সাধারণ দিনে পুণ্যের খাতিরে এবং সওয়াবের আশায় কেউ নিজের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য এ'তেকাফ করতে চায় তাহলে তারও অনুমতি আছে আর এ সম্পর্কে কোনো নিষেধাজ্ঞা কোথাও পাওয়া যায় না। এছাড়া কোনো কোনো ফিকাহ্বিদ মহিলাদের বাড়িতে এ'তেকাফ করাকে উত্তম আখ্যা দিয়েছেন। অতএব, ফিকাহ্শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিদায়াহ্'তে লেখা আছে " আম্মাল মারআতু তা'তাকেফু ফী মাসজিদি বাইতিহা) (হিদায়াহ্, এ'তেকাফ অধ্যায়) অর্থাৎ,

মহিলা নিজের বাড়িতে নামায পড়ার স্থানে এ'তেকাফে বসতে পারে। সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, "মসজিদের বাইরেও এ'তেকাফ করা যেতে পারে তবে, মসজিদের মতো সওয়াব পাওয়া যাবে না।"

(দৈনিক আল্ ফযল, ৬ই মার্চ, ১৯৯৬)

প্রশ্ন: ১২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার গুলশানে ওয়াক্ফে নও অনুষ্ঠানে একটি মেয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে জিজ্ঞেস করে যে, মেয়েদের কোন্ বয়সে স্ক্যার্ফ বা ওড়না পরা উচিত?

হুযূর আনোয়ার (আই.) এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন,

উত্তর: যখন তোমার বয়স পাঁচ বছর হয়ে যাবে তখন খবমমরহমং(তথা পায়জামা) ছাড়া তোমার ফ্রক পরা উচিত হবে না। তোমার পা আবৃত থাকা উচিত যাতে তুমি অনুভব করো যে, ধীরে ধীরে আমাদের যে পোশাক আছে তা দিয়ে আমাদের শরীরকে আবৃত করতে হবে। হাতাবিহীন ফ্রক পরা উচিত নয়। এরপর যখন ছয়-সাত বছরের হয়ে যাবে তখন লেগিংস (তথা পায়জামা) পরার ক্ষেত্রে আরও সাবধান হতে হবে। আর তুমি যখন দশ বছরে পদার্পণ করবে তখন কিছুটা স্কার্ফ বা ওড়না পরার অভ্যাস করবে আর যখন এগারো বছরের হয়ে যাবে তখন পুরোপুরি স্কার্ফ বা ওড়না পরতে হবে। স্কার্ফ পরতে তো কোনো সমস্যা নাই। এখানেও মানুষ শীতের সময় স্কার্ফ পরিধান করে। শীত পড়লে (মানুষ) নিজেদের কান ঢাকে না? সেটিও স্কার্ফই হয়ে থাকে। এমন স্কার্ফ (তথা ওড়না) পরিধান করো। কোনো কোনো মেয়ে আছে যাদের দশ বছর বয়স হয়ে গেলেও দেখতে ছোটই মনে হয় আবার কতেক এমন আছে যাদেরকে দশ বছর বয়সেই বারো বছরের মেয়েদের মতো দেখা যায়। তাদের উচ্চতা বেড়ে যায়। কাজেই, প্রত্যেক মেয়ে নিজের দিকে দেখুক! যদি সে দেখতে বড় মনে হয় তাহলে তার স্কার্ফ পরা উচিত। অল্প বয়সে স্কার্ফ পরার অভ্যাস করতে পারলে বড় হয়ে গেলে আর লজ্জা লাগবে না, নতুবা সারাজীবন লজ্জাই পেতে থাকবে। যদি তুমি বলো যে, বারো বছর বয়সে, তের বছর বয়সে, চৌদ্দ বছর বয়সে গিয়ে স্কার্ফ পরবো তাহলে শুধু ভাবতেই থাকবে আর এরপরে তোমরা লজ্জা পেতে আরম্ভ করবে। তখন তোমরা বলবে ওহ্ হো, মেয়েরা (বা আমার সহপাঠীরা) পাছে আবার আমাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে আরম্ভ না করে। আমি স্কার্ফ পরলে তারা আমাকে নিয়ে হাসবে। তাই (এখন থেকেই) কখনও কখনও স্কার্ফ পরার অভ্যাস করো। সাত, আট, নয় বছরে স্কার্ফ পরা শুরু করো। আর অন্য মেয়েদের সামনেও পরো যাতে তোমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়। এরপর যখন তুমি দেখতে বড় মনে হবে তখন পুরোপুরি স্কার্ফ পরো, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছ? তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আর বড় মেয়েদের এতটুকু জানা আবশ্যক যে, আসলে পর্দার উদ্দেশ্য হল লজ্জা-সম্ভ্রম বোধ থাকা। আর যারা ইউরোপিয়ান কিংবা পাশ্চাত্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়, অতীতকালে তাদের (ইউরোপিয়ানদের) পোশাকও এই পর্যন্ত হতো, (এ সময় হুযূর আনোয়ার তাঁর হাতের কব্জি পর্যন্ত ইঙ্গিত করে বলেন- সংকলক) লম্বা ম্যাক্সি বা ফ্রক পরিধান করতো। এখন তো এরা স্বল্পবসনা হয়ে ঘোরাফেরা করে, তাই না?

প্রশ্ন হল, পুরুষদের ভাল এবং Well Dressed তখন বলা হয় যখন সে ফুল প্যান্ট পরে, কোট গায়ে দেয় এবং টাই লাগায় আর মহিলাদের বলে, তোমাদেরকে Well Dressed তখন বলা হবে যখন তোমরা মিনি স্কার্ট পরিধান করবে। এর দর্শন কী তা আমি বুঝি না।

তাই পুরুষদের দিকে দেখবে না, আর মহিলারাও যারা নিজেদেরকে স্বল্পবসনা করে তারা নিজেদের অসম্মান করে। তাই আহমদী মেয়ে, আহমদী মহিলাদের সম্মান এতেই নিহিত যে, আপনারা নিজেদের সম্মান-সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা করুন। কেননা আসল জিনিস হল, আত্মসম্ভ্রমবোধ। আর এই আত্মসম্ভ্রমবোধই অন্যদেরকে তোমাদের প্রতি নোংরা দৃষ্টি ফেলতে বাধা দেয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal, From Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

রোযা সম্পর্কিত খুঁটিনাটি প্রশ্নের উত্তর

রোযা ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর একটি আর তা পালন করা আবশ্যিক কর্তব্য। রোযা সম্পর্কে ছোট ছোট কিছুপ্রশ্নেরও অবতারণা হয়। যেমন- সেহ্‌রি ও ইফতারের সময় নির্দিষ্টকরণ, অসুস্থ্যতার ক্ষেত্রে, মুসাফির অবস্থায় করণীয় ইত্যাদি। অনুরূপভাবে আরো কিছুপ্রশ্ন করা হয়ে থাকে আর সঠিকভাবে রোযা রাখার জন্য এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা একান্ত জরুরী।

এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে হাকাম ও আদল করে পাঠিয়েছেন। যার দায়িত্ব ছিল ইসলামী শিক্ষার উপর ভিত্তি করে ধর্মের বিবাদমান বিষয়গুলো সম্পর্কে ন্যায়-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করা এবং ধর্মীয় বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেয়া। এ অনুসারে আমরা দেখতে পাই তিনি তাঁর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে গেছেন। ধর্মের যে অঙ্গনেই মতভেদ ও সমস্যা ছিল সেসব ক্ষেত্রেই তিনি ন্যায়-ভিত্তিক মীমাংসা এবং সমধান দিয়ে গেছেন, যা সমস্ত মতভেদ দূর করে যৌক্তিকভাবে ইসলামী শিক্ষাকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করেছে। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুগে বিভিন্ন মাসলা মাসায়েলের সমাধান পেতে এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আমাদের উচিত তাঁর মূল্যবান এসব মতামত শিরোধার্য করা।

যেমনটি আমি বলেছি রোযার দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন উঠানো হয়,তেমন কিছুপ্রশ্নের উত্তর বা এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অবস্থান কী ছিল বা তিনি কী নির্দেশনা দিয়েছেন, তাঁর ফতওয়া কী ছিল, সে সম্পর্কে এখন আমি আলোচনা করব।

অতএব, প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ কিছুরোযা-সংক্রান্ত মাসলাহ মাসায়েলের সামধান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের কিছুঘটনার আলোকে সম্মানিত পাঠকদের জন্য নিম্নে তুলে ধরছি। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যেকথাটি স্মরণ রাখতে হবে তা হল, ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি হল তাকওয়া। তাই তাকওয়া সমুন্নত রেখে রোযা-সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উক্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, "আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিষ্ঠার সাথে রোযা রাখ।" (কিশতিয়ে নূহ, রুহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১৫)

রোযা রাখার ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম যে বিষয়টি আসে সেটি হল কখন থেকে রোযা রাখার নির্দেশ। কেননা আমরা আমাদের সমাজে এমন কিছুলোককে দেখতে পাই যারা বলে সৌদি আরবে যেদিন রোযা রাখবে সেদিন থেকেই রোযা রাখতে হবে এবং সৌদি আরবে যেদিন ঈদ করবে সেদিনই ঈদ করতে হবে। তাদের এ কথা অনুযায়ী তারা সাধারণত আমাদের একদিন পূর্বেই রোযা রাখে এবং ঈদও করে। এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের শিক্ষা কী তা আমাদের জানা উচিত।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তাই সরল এবং সাধারণ মানুষের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা হল, তারা যেন জ্যোতির্বিদদের মুখাপেক্ষী না থাকে আর কোন তারিখে চাঁদ উদিত হয় তা নিশ্চিৎ হওয়ার জন্য চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে। এতটুকুজ্ঞান থাকা আবশ্যক যে, দিনের সংখ্যা যেন ত্রিশের অধিক না হয়।

এটিও স্মরণ রাখা উচিত, যুক্তিগত দিক থেকেই জ্যোতির্বিদদের হিসাবের উপর চাঁদ দেখার বিষয়টির প্রাধান্য রয়েছে। ইউরোপের দার্শনিকেরাও চাঁদ দেখাকে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করার সুবাদে দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগাতে বিভিন্ন প্রকার অনুবীক্ষণ এবং দুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছে।"

(সুরমায়ে চশমায়ে আড়িয়া, রুহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২-১৯৩)

মোট কথা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হল চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখেই ঈদ কর। মহানবী (সা.)-এর হাদীসেও আমরা এ কথাই দেখতে পাই যে, 'চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর।'

(তিরমীযি, কিতাবুস সওম, হাদীস নং-৬৮৮) এ ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা সৃষ্টি হয় আর তা হল চাঁদ একদিন পূর্বে উদিত হয় এবং কোন কারণে দেখা না যায় আর পরে বুঝা যায় যে, চাঁদ একদিন পূর্বেই উদিত হয়েছে, এমন অবস্থায় কোন্ নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত? কেননা এমন হলে একটি রোযা তো বাদ পড়ে যাবে।এ ক্ষেত্রে কী করতে হবে? এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। শিয়ালকোট থেকে এক বন্ধুএরূপ পরিস্থিতির উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে লিখেন যে, এখানে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায় নি বরং বুধবারে দেখা গেছে অথচ বুধবারে রমযান আরম্ভ হয়ে গেছে। অত্র অঞ্চলে মোটের উপর এটিই হয়েছে আর এ কারণে বৃহস্পতিবারে প্রথম রোযা রাখা হয়। এখন কী করা উচিত? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এর জন্য রমযানের পর একটি রোযা রাখতে হবে।

(মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৭, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

অনুরূপভাবে, সেহ্‌রি খাওয়ার বিষয়টি রয়েছে। সেহ্‌রির সময় নিয়ে অনেক কথা রয়েছে যার প্রকৃত সমাধান সবারই জানা থাকা জরুরী।

এ-সংক্রান্ত একটি ঘটনার কথা হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন, কপুরথলার মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, আমি কাদিয়ানে মসজিদে মুবারকের সাথে সন্নিবেশিত কক্ষে অবস্থান করতাম। একবার আমি সেহ্‌রি খাচ্ছিলাম তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসেন। তিনি আমাকে সেহ্‌রি খেতে দেখে বলেন, আপনি কি সেহ্‌রির সময় ডাল-রুটিই খান? আর তখনই তিনি ব্যবস্থাপককে ডেকে বলেন,সেহ্‌রির সময় কি বন্ধুদের এমন খাবারই দেওয়া হয়? আমাদের যত বন্ধুআছে তারা সফরে নয়, তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করুন, তাদের কী ধরণের খাবার খাওয়ার অভ্যাস আছে? সেহ্‌রির সময় তারা যা খেতে পছন্দ করে সেই খাবারই যেন তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়। এরপর ব্যবস্থাপক আমার জন্য আরো খাবার নিয়ে আসেন কিন্তু আমি পূর্বেই খাবার শেষ করেছিলাম আর আযানও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হুযূর বলেন, খাও সময়ের পূর্বেই আযান দেওয়া হয়েছে, এই ব্যাপারে চিন্তা করো না।" (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৪র্থ অংশ, পৃ. ১২৭, রেওয়ায়েত নং ১১৬৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তাহাজ্জুদ পড়া এবং সেহ্‌রি খাওয়া সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ১৮৯৫ সনে পুরো রমযান মাস আমার কাদিয়ানে কাটানোর সৌভাগ্য হয়। আমি পুরো মাস হযরত সাহেবের পেছনে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ তারাবী পড়েছি। তাঁর রীতি ছিল তিনি রাতের প্রথম ভাগে বেতের পড়ে নিতেন আর রাতের শেষ প্রহরে পর্যায়ক্রমে দুই দুই রাকাত করে আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। আর এই নামাযে তিনি সবসময় প্রথম রাকাতে আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করতেন।

(সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

পর্যন্ত পড়তেন আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। এছাড়া রুকুএবং সিজদায় 'ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম বিরাহমাতিকা আসতাগীস' প্রায়শ পড়তেন আর এমন স্বরে পড়তেন যে, তাঁর আওয়াজ শোনা যেত।

এছাড়া সবসময়ই তিনি তাহাজ্জুদের পর সেহ্‌রি খেতেন। আর সেহ্‌রি খাওয়ার ক্ষেত্রে এত বিলম্ব করতেন যে, অনেক সময় খেতে খেতে আযান হয়ে যেত। অনেক সময় আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি খাবার খাওয়া অব্যাহত রাখতেন। এই অধম (অর্থাৎ মিয়া সাহেব) নিবেদন করছে যে, সত্যিকার অর্থে যতক্ষণ সুবহে সাদিক পূর্ব দিগন্তে দেখা না যায় ততক্ষণ তো সেহ্‌রি খাওয়া বৈধ। আযানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা ফজরের আযানের সময়ও সুবহে সাদিকের সাপেক্ষেই নির্ধারিত হয়, তাই বিভিন্ন স্থানের মানুষ সচরাচর আযানকে সেহ্‌রির শেষ সীমা মনে করে। কাদিয়ানে যেহেতু সুবহে সাদিক প্রস্ফুটিত হতেই ফজরের আযান হয়ে যায় বরং হতে পারে অনেক সময় ভুলবশত বা অসাবধানতাবশত এর পূর্বেও হয়ে যায়, তাই এমন সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আযানের প্রতি কর্ণপাত করতেন না বরং সুবহে সাদিক স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত সেহ্‌রি খেতেন। সত্যিকার অর্থে এ প্রসঙ্গে

শরীয়তের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, জ্ঞানগত বা হিসাবের দৃষ্টিকোণ থেকে যখন সুবহে সাদিকের উন্মেষ ঘটে তখনই খাবার ছেড়ে দেয়া উচিত। বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হল, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে যখন সুবহে সাদিকের শুভ্রতা প্রকাশ পায় তখন খাবার ছেড়ে দেওয়া উচিত। কেননা 'তাবায়্যান' শব্দ এদিকেই ইঙ্গিত করছে। হাদীসে বর্ণিত

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family
Bithari, 24 PGS (N)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

"আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাবগ্রহণকারী।"

(সূরা নিসা: ৮৭)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, বেলালের আযান শুনে সেহ্‌রি খাওয়া বন্ধ করবে না বরং ইবনে মাক্তুম-এর আযান পর্যন্ত পানাহার অব্যাহত রাখ। ইবনে মাক্তুম যেহেতু অন্ধ ছিলেন তাই সকাল হয়ে গেছে বলে হইচই আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।" (সীরতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, সংখ্যা ২ ২য় অংশ, রেওয়ায়েত নং ৩২০, পৃ. ২৯৫-২৯৬)

এ-সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দিন মরহুম সাহেবের স্ত্রী কাদিয়ানের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বরাতে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, ১৯০৩ সনের কথা, আমি এবং মরহুম ডাক্তার সাহেব রুঢ়কী থেকে এখানে আসি, চারদিন ছুটি ছিল। হুযূর জিজ্ঞেস করেন, সফরে রোযা রাখেননি তো? আমরা বললাম, না। হুযূর আমাদের থাকার জন্য গোলাপি কক্ষ বরাদ্দ করেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, আমরা রোযা রাখব। তিনি (আ.) বলেন, ভালো কথা। এরপর বলেন, আপনারা সফরে আছেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, কয়েকদিন এখানে অবস্থান করব, তাই রোযা রাখার ইচ্ছা হচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, ঠিক আছে,আমরা আপনাদেরকে কাশ্মীরি পরোটা খাওয়াব। আমরা ভাবছিলাম, আল্লাহ্‌ই জানে, কাশ্মীরি পরোটা না জানি কেমন হয়। যখন সেহ্‌রির সময় হয় আর আমরা তাহাজ্জুদ ও নফল শেষ করি, এরপর খাবার আসে তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং সেই গোলাপি কক্ষে আসেন (যা নিচের তলায় অবস্থিত ছিল)। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব উপরের তিন তলায় থাকতেন। তার বড় স্ত্রী করীম বিবি সাহেবা যাকে মৌলভীয়ানী বলা হত, তিনি কাশ্মীরি ছিলেন। তিনি ভালো পরোটা বানাতে পারতেন। হুযূর আমাদের জন্য তার হাতে পরোটা বানিয়েছিলেন। উপর থেকে গরম গরম পরোটা আসতো আর হুযূর (আ.) নিজেতা নিয়ে আমাদের সামনে রাখতেন এবং বলতেন, ভালো করে পেট ভরে খাও। আমার লজ্জা হচ্ছিল, ডাক্তার সাহেবও লজ্জিত ছিলেন কিন্তু আমাদের উপর হুযূরের স্নেহ এবং বদান্যতার যে প্রভাব ছিল তার ফলে আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আনন্দের শিহরণ অনুভূত হচ্ছিল। ততক্ষণে আযান হয়ে যায়। হুযূর (আ.) আমাদের বলেন, আরো খাও, এখনো অনেক সময় আছে। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৮) মানুষ এটি মেনে চলে না। খাও, এখনো অনেক সময় আছে। মুয়ায্‌যিন সময় হওয়ার পূর্বেই আযান দিয়ে দিয়েছে। আমরা যতক্ষণ খাচ্ছিলাম হুযূর দাঁড়িয়ে ছিলেন বা পায়চারি করছিলেন। যদিও ডাক্তার সাহেব বলেন, হুযূর! বসুন, আমি পরিচারিকাকে দিয়ে পরোটা আনিয়ে নিব বা আমার স্ত্রী নিয়ে আসবে, কিন্তু হুযূর সেকথা মানেন নি বরং আমাদের অতিথি সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এই খাবারে তরকারীও ছিল আর দুধ এবং সেমাই ইত্যাদিও ছিল। (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৫ম অংশ, পৃ. ২০২-২০৩, রেওয়ায়েত নং ১৩২০)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আরেকটি গুরুত্ব এবং অধিকাংশ মানুষের প্রশ্ন হল সফরও অসুস্থতার সময়কি রোযা রাখা বৈধ? এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, "আমার ভালোভাবে মনে পড়ে, খুব সম্ভব মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব, যিনি আজকাল লাহোরী জামা'তের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য। একবার তিনি বাহির থেকে এখানে আসেন, আসরের সময় ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে জোর দিয়ে বলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেল।আরো বলেন, সফরে রোযা রাখা বৈধ নয়। একইভাবে একবার অসুস্থতার প্রশ্ন আসলে তিনি বলেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, ধর্ম যে ছাড় দিয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা উচিত। ধর্ম কাঠিন্য নয় বরং স্বাচ্ছন্দ্য শিখায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, কেউ কেউ বলে, মুসাফির ও অসুস্থরা যদি রোযা রাখতে পারে তাহলে রাখা উচিত, আমরা একে সঠিক মনে করি না। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর উক্তি শুনিয়েছেন যে, সফর এবং অসুস্থতায় রোযা রাখা তিনি বৈধ মনে করতেন না আর তার দৃষ্টিতে এমন অবস্থায় রোযা রাখলেও,পরে তা আবার রাখা আবশ্যক। এটি শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হ্যাঁ, আমাদেরও একই বিশ্বাস।"

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৩৭)

আরেকটি ঘটনা রয়েছে, এ থেকে দুটি বিষয় পরিষ্কার হয়। একটি হল সফরে রোযা রাখা এবং আরেকটি কাদিয়ানে রোযা রাখা। একবার বক্তৃতা করার সময় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে আর তা হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রোযা সম্পর্কে এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, "রোগী এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে নির্দেশ লঙ্ঘনের ফতওয়া বর্তাবে।" অথচ আল ফযলে আপনার পক্ষ থেকে এই ঘোষণা ছাপা হয়েছে যে, আহমদী বন্ধুরা যারা সালানা জলসায় আসবেন, তারা এখানে এসে রোযা রাখতে পারবেন কিন্তু যারা রোযা রাখবে না এবং পরে রাখবে তাদের বিরুদ্ধেও কোন আপত্তি বর্তাবে না।এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "প্রথমত আমি একথা বলতে চাই যে, আমার কোন ফতওয়া আল ফযলে ছাপেনি। হ্যাঁ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন রেওয়ায়েতের বরাতে একটি ফতওয়া ছেপেছে। আসল কথা হল, খিলাফতের প্রথম দিকে আমি সফরে রোযা রাখতে বারণ করতাম, কেননা আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছি, তিনি মুসাফিরকে রোযা রাখার অনুমতি দিতেন না। একবার আমি দেখেছি, মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব রমযানে এখানে (কাদিয়ানে) আসেন, তিনি রোযা রেখেছিলেন। আসরের সময় তিনি যখন পৌঁছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেলুন, সফরে রোযা রাখা অবৈধ। এটি নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক এবং কথা হয়, যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) চিন্তা করেন, কোথাও আবার কেউ হোঁচট না খায়, তাই তিনি ইবনে আরাবীর উক্তি উপস্থাপন করে বলেন, তিনিও একই কথা বলেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার উপর এই ঘটনার যে প্রভাব ছিল সেই কারণে আমি সফরে রোযা রাখতে বারণ করতাম। ঘটনাক্রমে একবার মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব এখানে রমযান মাস কাটানোর জন্য আসেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি যারা বাহির থেকে আসেন আপনি তাদেরকে রোযা রাখতে বারণ করেন। কিন্তু আমার রেওয়ায়েত হল, এখানে এক ব্যক্তি আসেন, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, আমি এখানে অবস্থান করব, তাই এখন কি আমি রোযা রাখব নাকি রাখব না?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হ্যাঁ আপনি রোযা রাখতে পারেন, কেননা কাদিয়ান আহমদীদের জন্য দ্বিতীয় জন্মভূমির মর্যাদা রাখে। যদিও মরহুম মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খুব কাছের সাহাবী ছিলেন, নৈকট্য প্রাপ্ত ছিলেন, তথাপি আমি শুধু তাঁর রেওয়ায়েতই গ্রহণ করিনি, এ সম্পর্কে মানুষের সাক্ষ্যও গ্রহণ করেছি আর জানা গেছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাদিয়ানে অবস্থানকালে রোযা রাখার অনুমতি দিতেন, অবশ্য আসা এবং যাওয়ার দিন অনুমতি দিতেন না, সেকারণে আমার প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হয়েছে। এবার রমযানে যখন বার্ষিক জলসা ঘনিয়ে আসছিল আর প্রশ্ন উঠানো হয় যে, তাদের রোযা রাখা উচিত কিনা তখন এক ব্যক্তি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ কথা বলেন, কাদিয়ানে এসে রোযা রাখা বৈধ। এখন তাঁর একটি ফতওয়া আমরা গ্রহণ করব আর অপরটি প্রত্যাখ্যান করব, এমনটি হওয়া উচিত নয়। এভাবে সেই কথাই প্রযোজ্য হবে যা এক পাঠান সম্পর্কে প্রসিদ্ধ রয়েছে। পাঠানরা ফিকাহ্ শাস্ত্রকে কঠোরভাবে মেনে চলে। এক পাঠান ছাত্র ছিল। সে পড়েছে যে, নামাযে" হরকতে কবীরা' বা খুব বেশি নড়াচড়া (যেমন নামায ছেড়ে দরজা খুলে দেওয়া ইত্যাদি) করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। মহানবী (সা.) সম্পর্কে হাদিসে সে পড়ল যে, তিনি একবার নামাযে নড়াচড়া করেছেন তখন সে বলল, ও-হো, মুহাম্মদ (সা.)-এর তো তাহলে নামায নষ্ট হয়ে গেছে। কেননা কদূরী-তে লেখা আছে, 'হরকতে কবীরা'বা খুব বেশি নড়াচড়া করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

অতএব, যিনি এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, সফরে রোযা রাখা উচিত নয়, তিনি আবার একথাও বলেছেন, কাদিয়ান আহমদীদের জন্য দ্বিতীয় মাতৃভূমি আর এখানে রোযা রাখা বৈধ। তাই এখানে রোযা রাখা তাঁর প্রদত্ত ফতওয়া অনুসারেই সঠিক, যদিও এর আরো কারণাদি রয়েছে।"

(আল ফযল, ৪ জানুয়ারি, ১৯৩৪, পৃ. ৩-৪, ২১তম খণ্ড, সংখ্যা ৮০)

কোন একস্থানে অবস্থান কালে রোযা রাখা সম্পর্কে হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ সরওয়ার শাহ্ সাহেব লিখেন, রোযা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তিকে এক জায়গায় তিন দিনের অধিককাল পর্যন্ত অবস্থান করতে হয় তাহলে তার রোযা রাখা উচিত। তিন দিনের কম যদি থাকতে হয় তাহলে রোযা রাখা উচিত নয়। আর কাদিয়ানে যদি স্বল্পকাল অবস্থান সত্ত্বেও কেউ রোযা রাখে তাহলে পরে আর রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। (ফতওয়ায়ে হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ সারওয়ার শাহ্ সাহেব, রিজিষ্ট্রার নং ৫, দারুল ইফতাহ্, রাবওয়া, ফিকাহ আল মাসীহ্, পৃ. ২০৮, বাব রোযা অর রমাযান)

যেহেতু কাদিয়ান আহমদীদের দ্বিতীয় মাতৃভূমি, তাই এখানে তিন দিনের চেয়ে কম সময় অবস্থান হলেও রোযা রাখতে পারে, কিন্তু অন্য স্থানে তিন দিন অবস্থান করলে রোযা রাখতে পারবে।(আ.)-এর যুগে রমযানে যখন জলসা হত আমরা স্বয়ং অতিথিদের সেহ্‌রি খাইয়েছি। এই প্রেক্ষিতে আমি যে, এখানে জলসায় আগমনকারীদের রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছি, তা-ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই একটি ফতওয়া। পূর্বের আলেমগণ সফরে রোযা রাখা বৈধ আখ্যা দিয়ে দিত আর অ-আহমদী মৌলভীরা তো বর্তমান সময়ের সফরকে সফর বলেই গণ্য করে না। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সফরে রোযা রাখতে বারণ করেছেন, আবার তিনি নিজেই এ মুসাফির ও রুগ্নদের রোযা না রাখা-সংক্রান্ত একটি ঘটনা রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি জানতে পারেন যে, লাহোর থেকে শেখ মুহাম্মদ চট্টসাহেব নামে এক ব্যক্তি এসেছেন আর অন্য মানুষও এসেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 1 May 2025 Issue No.18

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

তাঁর মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিনে বাহিরে আসেন, উদ্দেশ্য ছিল তিনি ভ্রমণের জন্য বাইরে যাবেন আর বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতেরও উপলক্ষ সৃষ্টি হবে, যারা বাহির থেকে এসেছেন তাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে। অন্যরাও জানতে পারে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাহিরে আসবেন। তাই অনেকেই ছোট মসজিদে (অর্থাৎ মসজিদে মুবারকে) সমবেত হন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দরজার বাহিরে আসেন রীতি অনুসারে খোদ্দামরা পতঙ্গের মত তাঁর দিকে ছুটে যায়, তিনি শেখ সাহেবের দিকে তাকিয়ে সালামের পর বলেন, আপনি কেমন আছেন? তিনি পুরোনো জানাশোনা মানুষ ছিলেন বয়োবৃদ্ধ চট্টসাহেব বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাকীম মুহাম্মদ হোসাঈন কোরেশী সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন, তার যেন কোন কষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করা আপনার দায়িত্ব, তার থাকাখাওয়ার সুব্যবস্থা করুন। যে জিনিসেরই প্রয়োজন হয় আমাকে জানান আর মিয়াঁ নাজমুউদ্দিন সাহেবকে তাগাদা দিন যে, তার খাবারের জন্য যা যথাযথ এবং যা তিনি খেতে পছন্দ করেন তা যেন প্রস্তুত করেন। হাকীম সাহেব বলেন, জি ঠিক আছে। ইনশাআল্লাহ্, কোন কষ্ট হবে না। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অতিথিকে সম্বোধন করে বলেন, আপনি নিশ্চয় রোযা রাখেন নি। সেই ব্যক্তি বলেন, আমি রোযা রেখেছি। তিনি আহমদী ছিলেন না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কুরআন যেসব ছাড় দিয়েছে সেগুলো অনুসরণ করাও তাকওয়া। আল্লাহ্ তা'লা মুসাফির এবং রুগ্নদের অন্য সময় রোযা রাখার অনুমতি এবং ছাড় দিয়েছেন, তাই এই নির্দেশও মেনে চলা উচিত। তিনি বলেন, আমি পড়েছি অধিকাংশ জ্যেষ্ঠ বা উম্মতের বুযূর্গদের মতামত হল, যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় এবং সফরে রোযা রাখে সে পাপ করে। কেননা আসল বিষয় হল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, নিজের ইচ্ছায় নয় বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তাঁর আনুগত্যের মাঝে নিহিত। অর্থাৎ তিনি যে নির্দেশ দেন তার আনুগত্য করা উচিত আর নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন কথা যোগ করা উচিত নয়। তিনি এই নির্দেশই দিয়েছেন যে,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৫) এতে অন্য কোন শর্ত রাখেন নি যে, এমন সফর হতে হবে আর এ ধরণের অসুস্থতা হতে হবে। আমি সফরে রোযা রাখি না অনুরূপভাবে, অসুস্থ অবস্থায়ও রোযা রাখি না। আজও আমার স্বাস্থ্য ভালো না, তাই আমি রোযা রাখি নি। হাঁটাচলা করলে রোগের প্রকোপ কিছুটা কমে যায়, তাই আমি বাহিরে যাব।

(অতিথিকে তিনি জিজ্ঞেস করেন,) আপনিও যাবেন নাকি?বয়োবৃদ্ধ চট্টসাহেব বলেন, না আমি যেতে পারব না, আপনি ঘুরে আসুন। পবিত্র কুরআনে নিঃসন্দেহে এই নির্দেশ রয়েছে কিন্তু সফরে যদি কোন কষ্ট না হয় তাহলে রোযা কেন রাখা হবে না? হুযূর বলেন, এটি আপনার মতামত, কুরআন শরীফে কষ্ট হওয়া বা কষ্ট না হওয়ার কথা আদৌ উল্লেখ করা হয় নি। আপনি খুবই বয়োবৃদ্ধ এক ব্যক্তি। জীবনের কোন ভরসা নেই, মানুষের সেই পথই অনুসরণ করা উচিত, যাতে খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন এবং সিরাতে মুস্তাকীম পাওয়া যায়। তখন বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেন, আমি তো এ জন্যই এসেছি যেন আপনার কাছে অবস্থান করে কিছুটা উপকৃত হতে পারি। এই পথই যদি সত্য হয় তাহলে কোথাও এমন যেন না হয় যে, আমরা ঔদাসিন্যের মাঝে থেকেই মারা যাই। হুযূর (আ.) বলেন, এটি খুবই ভালো কথা। এরপর তিনি বলেন, আমি কিছুটা ঘুরে আসি, আপনি বিশ্রাম করুন।"

(আল হাকাম, ৩১ জানুয়ারি ১৯০৭, পৃ. ১৪, ১১তম খণ্ড, সংখ্যা ৪)

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে রুগ্ন এবং মুসাফিরের রোযা রাখার প্রসঙ্গে কথা উঠে। হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেব পূর্বের কথাই শুনিয়েছেন যে, শেখ ইবনে আরাবীর উক্তি রয়েছে, রুগ্ন এবং মুসাফির রোযার সময় রোযা রাখলেও আরোগ্য লাভের পর অর্থাৎ রমযানের পর তার জন্য পুনরায় রোযা রাখা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের মাঝে যারা অসুস্থ বা সফরে থাকে তারা রমযান মাসের দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর রোযা রাখবে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা একথা বলেন নি যে, রুগ্ন ব্যক্তি বা মুসাফির যদি হঠকারিতা প্রদর্শন করে বা নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করে এই দিনগুলিতে রোযা রাখে তাহলে পরবর্তীতে আর রোযা রাখার প্রয়োজন নেই।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৫) আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট নির্দেশ হল, তাকে পরেও রোযা রাখতে হবে।পরবর্তীতে রোযা রাখা তার জন্য আবশ্যক। সে যদি রোযা রাখে এটি তার জন্য অতিরিক্ত একটি বিষয়, এটি তার নিজেরই সিদ্ধান্ত, এর ফলে পরে রোযা রাখা সম্পর্কে খোদার যে নির্দেশ রয়েছে সেটি টলতে পারে না। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি সফর এবং অসুস্থ অবস্থায় রমযান মাসে রোযা রাখে, সে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট নির্দেশের অবাধ্যতা করে। আল্লাহ্‌র পরিস্কার নির্দেশ হল, রুগ্ন এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে। সুস্থ হওয়ার পর আর সফর সমাপ্তির পর সে রোযা রাখবে। আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ মেনে চলা উচিত, কেননা পরিত্রাণ লাভ হয় খোদার অনুগ্রহে, কর্মবলে কেউ মুক্তি পেতে পারে না। রোযার মাধ্যমে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারবে না। খোদা তা'লা এই কথা বলেন নি যে, রোগ সামান্য না বেশি, সফর সংক্ষিপ্ত নাকি দীর্ঘ, বরং এটি সর্বজনীন একটি নির্দেশ, এটি মেনে চলা উচিত। রুগী এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তারা নির্দেশ লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী হবে।"

(মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৩০-৪৩১, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

(১ম পাতার শেষাংশ...)

পারল যে, এরা হল কবি, যারা নিজের কবিতা শোনাতে এসেছে। প্রত্যেক কবি পালাক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে কবিতা শোনাতে থাকে। এখন সে খুব ঘাবড়ে গেল, ভাবল, সে এখন কি করবে? কবিতা বলার ক্ষমতা তো তার ছিল না। কিন্তু রসিকতা বোধ তার ছিল। কবিরা তাদের কবিতা শোনানোর পর বাদশাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার নিয়ে ফিরে গেল। এরপর বাদশাহ তাকে সম্বোধন করে বললেন, এবার তুমি শুরু কর। সে বলল, হুযুর! আমি কবি নই। বাদশাহ প্রশ্ন করলেন, এখানে কেন এসেছ? সে বলল, আমি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ । কবিদের পিছনে পথহারারা এসে থাকে। তারা ছিল কবি আর আমি হলাম পথভোলা পথিক। তার এই রসিকতা বাদশাহর পছন্দ হল। আর তাকেও পুরস্কার দেওয়ার আদেশ দিলেন। এটা

(১ম পাতার শেষাংশ)

নিঃসন্দেহে একটা জনশ্রুতি, কিন্তু কবিদের অনুসারীরা সাধারণত পথভ্রষ্টই হয়ে থাকে। কেননা কবি কখনও এক কথা বলে, কখনও অন্য কথা বলে। তাদের কোনও ধরাবাধাঁ নীতি থাকে না। কখনও তারা রসিকতা করে মানুষকে হাসায়, কখনও ইমাম হোসেন এর শাহাদতের ঘটনা স্মরণ করিয়ে মানুষকে কাঁদায়। কখনও প্রশংসাসূচক কাসিদা পাঠ করে, কখনও তিরস্কারমূলক কবিতা পড়ে। মোটকথা বনে বাদাড়ে উন্মাদের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু মহম্মদ (সা.) পৃথিবীতে একেশ্বরবা প্রসারের জন্য এসেছেন আর একটি লক্ষ্যই দিবারাত্র তার মাথায় ঘোরাফেরা করত। আর এর জন্যই তিনি কষ্ট সহ্য করেছেন। তাই কিভাবে তোমরা বলতে পার যে, সে তিনি কবি। কবি হলে তাঁর কোনও উদ্দেশ্য থাকত না। যে দিক মানুষের ভিড় দেখতেন, সেদিকেই রওনা দিতেন, এবং তাদেরকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি সমগ্র বিশ্বকে নিজের বিরোধীতে পরিণত করেছেন আর সকলকে একত্ববাদের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি কবি হলেন কিভাবে?

এরপর বলা হয়েছে- وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ কবিদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল, তাদের কথা ও কাজের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। তারা যা কিছু মুখে বলে তা কাজে করে না। অর্থাৎ তারা যদি কবিতায় মানুষকে উত্তম আচরণ তথা নৈতিকতার উপদেশ দিয়ে থাকে, তবে দেখা যায় সে নিজেই মাতাল। আর যদি সে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করার উপদেশ দেয়, তবে দেখা যায় সে নামায রোযার কাছেও যায় না। কিন্তু মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) কথাই হল তাঁর কাজ। যে কথা তাঁর কাজে সেটিই তার মুখে থাকে। তাই মহম্মদ (সা.) কে কবি বলা সত্যকে অস্বীকার করা এবং সত্যকে অনুধাবন করার পরিণাম। গভীরভাবে অভিনিবেশ করলে তোমরা দেখতে পাবে যে, মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এবং কবিদের কথায় এবং চরিত্রে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের মাঝে কোনও তুলনাই চলে না।

(তফসীর কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৫৫)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir